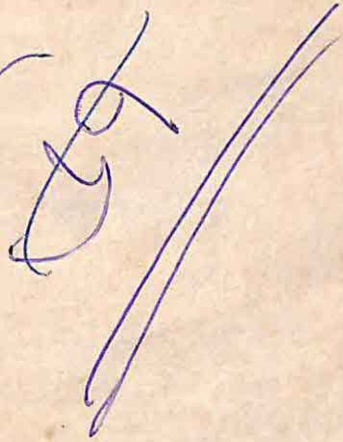
রসায়নের জাদু

অমরনাথ রায়



রসায়নের জাদু

অমরনাথ রায়

মুখার্জী ব্রাদার্স কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৯০

প্রকাশক
সুকুমার মুখার্জী
মুখার্জী ব্রাদার্স
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

মূল্য : ছয় টাকা

রসায়নের জাদু

রসায়নের জাদু

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে (১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থ তুলে দিলাম আমার দেশের কিশোর-কিশোরীদের হাতে।

—অমরনাথ রায়

রায়বাড়ী
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
মহালয়া, ১৯৮২

রসায়নের জাদু

আমাদের বাড়ির কাছেই নদীয়ার মহারাজার প্রাসাদ। আজও সে প্রাসাদ রয়েছে, তবে জরাজীর্ণ অবস্থায়। প্রাসাদের সামনে বিরাট এক মাঠ। বছরের বিভিন্ন সময়ে সে মাঠে ফুটবল খেলা হয়, ক্রিকেট খেলা হয়, কখনও বা জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর ছেলেরা কুচকাওয়াজ করে।

দোলপূর্ণিমার পরের পূর্ণিমায় নদীয়ার রাজবাড়িতে তিন দিন ব্যাপী এক বিরাট উৎসব হয়। জেলার বারোটি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বারোটি দেব-দেবীকে সেই উৎসব উপলক্ষে নিয়ে আসা হয় কৃষ্ণনগরে। রাজবাড়ির নাটমন্দিরে দেব-দেবীদের রেখে তিন দিন ধরে পূজার্চনা করা হয়।—এই উৎসবের নাম 'বারোদোল'।

'বারোদোল' উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়িসংলগ্ন মাঠে বসে এক বিরাট মেলা। সে মেলার নাম 'বারোদোলের মেলা'। মেলার জাঁকজমক প্রধানত তিন দিন থাকলেও মেলা চলে প্রায় একপক্ষ কাল। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজারে হাজারে মানুষ আসে মেলায়।

দিনের বেলায় কড়া রোদ্দুরে মেলা তেমন জমে না। জমে সন্ধ্যার পর থেকে। আলোর বন্যা বয়ে যায় মেলাপ্রাঙ্গণে। সেই সঙ্গে বয় আনন্দের বন্যাও। দর্শকদের কলকোলাহল তো আছেই। সেই সঙ্গে আছে লাউড স্পিকারে কলের গান এবং দোকানিদের হাঁক-ডাক। কেউ হাঁকে: গরম পাঁপর, গরম আলুর চপ, কেউ হাঁকে: শরবত চাই—ঠাণ্ডা শরবত, কেউ বা হাঁকে: লে লে বাবু চার আনা—যা লেবে তা চার আনা।

মেলার একপ্রান্তে বসে নাগরদোলার সারি। ছোটরা ভিড় জমায় সেখানে। মেলার মাঝামাঝি জায়গায় বসে মনোহারী দোকানের সারি। সেখানে ছোটদের তো বটেই, বড়দেরও মন হরণ করার মতো পসরা সাজিয়ে বসে দোকানিরা। হরেক রকমের খেলনা, কাচের চুড়ি, পুঁতির মালা থেকে শুরু করে ছুরি-কাঁচি, পাথরবাটি, মায় হাতা-খুন্তি পর্যন্ত—সবই পাওয়া যায় মেলায়। জামা, জুতো, মাদুর, শীতলপাটি, কুলো-ধামা—কিছুই বাদ যায় না। তারপর আছে মাটির পুতুল। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল ভারত-বিখ্যাত তো বটেই, জগদ্বিখ্যাত বললেও ভুল হয় না। হরেক রকমের মাটির পুতুল, মাটির ফলমূল, মসলা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, দেবদেবীর মূর্তি ও মনীষীদের মূর্তিতে প্রতিটি দোকান ঠাসা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তো বটেই, বিদেশেও এইসব মাটির জিনিসের চাহিদা আছে। এইসব মাটির জিনিসের রঙের বাহার আর শিল্পনৈপুণ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মৃৎশিল্পীদের এই দোকানগুলিতে বেচাকেনা বোধকরি সবচেয়ে বেশি হয়। বাইরের লোক মেলায় এলে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল না কিনে ঘরে ফেরে না।

মাঠের যে প্রান্তে রাজার দীঘি, সেই প্রান্তের বিপরীত দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছোট-বড় অনেক তাঁবু পড়ে। বড় তাঁবুর ভেতরে সার্কাস দেখানো হয়। আর ছোট তাঁবুর ভেতরে দেখানো হয় 'ম্যাজিক'—আজব সব কাণ্ডকারখানা। ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবার কাছেই এ সব অতি প্রিয়। তাই মেলার এই প্রান্তটির আকর্ষণ খুব বেশি।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা বলছি। আমি তখন ছোট। ইস্কুলে পড়ি। সেবার বারোদোলের মেলায় প্রধান আকর্ষণ ছিল এক আজব ম্যাজিক—নাম 'রসায়নের জাদু'।

'রসায়ন' কি তা তখনও বুঝি না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন সহজ কথায়। বললেন : 'রসায়ন' হলো জড়

বিজ্ঞানের একটি শাখার নাম।—বিভিন্ন পদার্থের ধর্ম কি, কিভাবে এই পৃথিবীর অগণিত বস্তু গড়ে ওঠে, বিভিন্ন বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে কি কি নতুন পদার্থ পাওয়া যায়—এই সব ব্যাপারই রসায়ন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

যাই হোক্—অভিনব এই ম্যাজিকটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল যে, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজের উৎসাহী জনকয়েক বিজ্ঞানের ছাত্র এই ম্যাজিকের উদ্যোক্তা। এ ম্যাজিক নিছক ভেল্‌কি বাজি নয়—বিজ্ঞান ভিত্তিক ভেল্‌কি বাজি। কাজেই এই ভেল্‌কি বাজি দেখার কৌতূহল হলো সবারই। বাবার সঙ্গে আমিও একদিন গেলাম 'রসায়নের জাদু' দেখতে। টিকিট মাত্র পাঁচ পয়সা।

জাদুকর একজন নয়—তিনজন। তাঁদের বয়সও বেশী নয়—বড় জোর উনিশ কি কুড়ি হবে। পোশাক-পরিচ্ছদ বিচিত্র ধরনের। পরনে লাল শার্ট আর নীল ট্রাউজার। গলা থেকে পা অবধি কালো রঙের একটা আলখাল্লা গোছের কাপড়, ফিতে দিয়ে বেশ আঁটো-সাঁটো করে বাঁধা। বাবা বললেন, ওর নাম 'অ্যাপ্রন'। জামা-কাপড়কে নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই 'অ্যাপ্রন' পরার প্রয়োজন হয়।—এ ছাড়া জাদুকরদের প্রত্যেকের হাতে আছে একটা ক'রে জাদুদণ্ড।

তাঁবুর নীচে সারি সারি কাঠের টেবিল। আর সেই টেবিলগুলির ওপর সারি সারি বিচিত্র দর্শন কাচের যন্ত্রপাতি সাজানো। পাশে একটি র‍্যাক। তাতে ছোট, বড়, মাঝারি—হরেক রকম কাচের শিশি বোতল। সেগুলি রঙ-বেরঙের কঠিন ও তরল পদার্থে ভরা।

টেবিলে গুটি কয়েক স্পিরিট ল্যাম্পও রয়েছে। 'স্পিরিট ল্যাম্প' অনেকটা কেরোসিনের কুপীর মতো দেখতে, তবে কেরোসিনে জ্বলে না—জ্বলে স্পিরিটে। সব দেখে মনে হলো—এ যেন ছোটখাটো একটি রসায়নাগার। বাবা বললেন, ঐ কাচের যন্ত্রপাতিগুলোর কোনটির নাম বীকার, কোনটির নাম বেসিন, কোনটির নাম ফ্লাস্ক,

আবার কোনটির নাম ফানেল। বিজ্ঞান বইতে পাতন যন্ত্রের ছবি দেখেছিলাম। পাতন প্রক্রিয়ার কথাও পড়েছিলাম। জাদুকরের টেবিলে সেইরকম একটা পাতন যন্ত্রও দেখলাম।

যন্ত্রপাতি যে টেবিলগুলির ওপর ছিল তার থেকে দু'-তিন হাত দূরে দু'-তিনখানি লম্বা বাঁশ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। আমরা অর্থাৎ দর্শকেরা যাতে হুমড়ি খেয়ে ঐ টেবিলগুলির ওপর গিয়ে না পড়ি, সেইজন্যেই ঐ বাঁশের বেড়া।

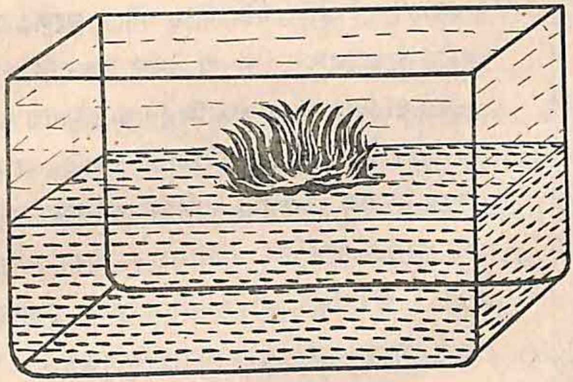
মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁবু নির্দিষ্ট সংখ্যক (সংখ্যাটি বোধ করি পঞ্চাশ কি ষাট হবে) দর্শকে ভরে গেল। কার্বাইডের কয়েকটি বাতি আগে থেকেই জ্বলছিল। এখন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো আরও দু'টি 'হ্যাজাক' বা 'ডে-লাইট'। জাদুকরের তাঁবুর প্রেক্ষাগৃহ আলোয় ঝলমল করতে লাগলো। সারি সারি কার্বাইড বাতিগুলি বিজলী বাতিকেও যেন টেক্কা দিল।

পঞ্চাশ-ষাট জন দর্শককে নিয়ে দু' ঘণ্টার 'শো'। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর এমনি দু'টি 'শো' হয়। আমি ছিলাম সেদিনকার প্রথম 'শো'-এর দর্শক। আর বয়সে ছোট বলে কিনা জানি না, আমার স্থান হয়েছিল একেবারে সামনের সারিতে—জাদুকরের টেবিলের পাশেই।

'শো' শুরু হবার সময় হতেই বাইরের গেটটি বন্ধ করে দেওয়া হলো। দর্শকদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে প্রথম জাদুকর হাসি মুখে এগিয়ে এলেন। এসে বললেন, আমার নাম 'মিস্টার এক্স'। আর আমার পাশে যাকে দেখছেন—আমারই মতন পোশাক পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—উনি হলেন আমার প্রথম সহকারী 'মিস্টার ওয়াই'। দোহাই আপনাদের, আমাদের আসল নাম জানতে চাইবেন না। আমাদের এই পরিচয়টুকু জেনেই ক্ষান্ত থাকুন।

—এইটুকু বলেই মিস্টার এক্স শুরু করলেন খেলা দেখানো।

● মস্ত বড় একটা কাচের বাটি। জাদুকর তাতে জল ঢাললেন। তারপর একটা শিশির মধ্যেকার তরল পদার্থ থেকে চিমটা দিয়ে এক টুকরো কঠিন পদার্থ টেনে বের করে এনে বাটির জলে ফেলে দিলেন। অমনি ঐ কঠিন পদার্থের টুকরোটি হিস্‌হিস্‌ শব্দ ক'রে ভাসতে ভাসতে জলের ওপর দীপ্ত শিখায় জ্বলে উঠলো। —জাদুকর এক্স বললেন, এ খেলার নাম 'জলের বুকে আগুনের শিখা।'

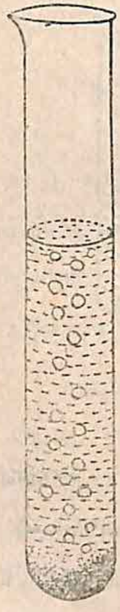


এই জাদুকরদের একটা মস্ত গুণ হলো এই যে, আর পাঁচজন জাদুকরের মতো এঁরা জাদুর কলা-কৌশল গোপন রাখেন না। প্রতিটি খেলা দেখানোর পর দর্শকদের বলে দেন—সেই খেলাটির কৌশল। বুঝিয়ে দেন—খেলাটির পিছনে রসায়ন বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব কাজ করছে।

প্রথম সহকারী মিস্টার ওয়াই বললেন, জলে যে কঠিন পদার্থটি ফেলা হয়েছিল, তার নাম পটাসিয়াম। জলের সঙ্গে এই ধাতু সাধারণ উষ্ণতায় বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস সৃষ্টি করে। জলের সংস্পর্শে এলেই পটাসিয়াম ধাতুতে আপনা থেকেই আগুন জ্বলে ওঠে। জলের বুকে সেই আগুনের শিখাই একটু আগে আপনারা দেখলেন।

● জাদুকর মিস্টার এক্স বললেন, এবারে দেখুন দ্বিতীয় খেলা। এ খেলার নাম 'লাল রঙের বিরঞ্জন'।

মিস্টার এক্স একটা পরীক্ষা-নলে বেগুনী রঙের কয়েকটি দানা রাখলেন। তারপর তার মধ্যে জল ঢেলে নলটিকে বেশ ক'রে ঝাঁকালেন। অমনি ঐ দানাগুলি জলে গুলে গিয়ে সৃষ্টি করলো লাল আভাযুক্ত বেগুনী রঙের দ্রবণ। এর পর জাদুকর ঐ পরীক্ষা-নলের মধ্যে কয়েক টুকরো কঠিন পদার্থ ও খানিকটা তরল পদার্থ ঢালতেই ধীরে ধীরে নলের দ্রবণটি বর্ণহীন হয়ে গেল। —কী সুন্দর ভেল্‌কি বাজি! —আমরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম।



সহকারী জাদুকর মিস্টার ওয়াই আমাদের বুঝিয়ে দিলেন রহস্যটা। তিনি বললেন. পরীক্ষা-নলে নেওয়া হয়েছিল পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানা। জল দিয়ে তারই রঙিন দ্রবণ তৈরি করে তাতে কয়েক টুকরো দস্তা (অবিশুদ্ধ) এবং লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো হয়েছিল। দস্তা ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় সদ্যোজাত হাইড্রোজেন। এই সদ্যোজাত (নবজাত) হাইড্রোজেনই বেগুনী রঙের পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণকে বর্ণহীন বা বিরঞ্জিত করে দেয়।

● জাদুকর একটা পরীক্ষা-নলে খানিকটা স্বচ্ছ তরল পদার্থ ঢাললেন। তারপর ওর মধ্যে কয়েক ফোঁটা অন্য একটা তরল পদার্থ ফেলে পরীক্ষা-নলটিকে ঝাঁকিয়ে নিয়ে পরীক্ষা-নলের মুখটি স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় ধরলেন। অমনি—পরীক্ষা-নলের মুখে নীল আলো জ্বলতে লাগলো।

এই খেলাটির রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিস্টার এক্স বললেন,

পরীক্ষা-নলে আমি নিয়েছিলাম ফরমিক অ্যাসিড। তারপর তাতে মিশিয়েছিলাম কয়েক ফোঁটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডটা ফরমিক অ্যাসিড থেকে জল শুষে নিয়ে কার্বন মনক্সাইড গ্যাস মুক্ত করে। কার্বন মনক্সাইড গ্যাস দাহ্য বলে পরীক্ষা-নলের মুখে নীল শিখা উৎপন্ন করে জ্বলে।

● এরপর জাদুকর একটা মোটা কার্ডবোর্ডের ওপর তুলি দিয়ে কি যেন লিখলেন। কালিটা বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ বলে জাদুকর কি লিখলেন তা আমরা বুঝতে পারলাম না।

উনি কার্ডবোর্ডটা আমাদের সামনে রাখলেন। তারপর একটা দিয়াশলাই কাঠি জ্বেলে কার্ডবোর্ডের যে অংশে লিখেছিলেন, সেই অংশে আগুন ধরিয়ে দিলেন। অমনি লেখার অন্তর্গত অক্ষরগুলিতে আগুন জ্বলে উঠলো। আগুনের অক্ষরগুলো আমরা স্পষ্ট পড়তে পারলাম। লেখা ছিল 'নমস্কার'।

জাদুকর বললেন, এই খেলায় আমি কালি হিসাবে ব্যবহার করেছি পটাসিয়াম নাইট্রেটের সংযুক্ত জলীয় দ্রবণ। আর 'নমস্কার' শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করে লিখেছি। তা না করলে আপনারা এ ভেল্‌কি দেখতে পেতেন না। পটাসিয়াম নাইট্রেটকে রসায়নের ভাষায় বলা হয় জারক দ্রব্য। জারক দ্রব্য বলে এই রাসায়নিক পদার্থটি অধিক উষ্ণতায় অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহ করে অক্ষরগুলির দহনে সহায়তা করে।

● অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম যে জাদুকরের টেবিলে গ্যাসজারে সবুজ আভাযুক্ত হলুদ রঙের একটা গ্যাস রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করায় জাদুকর বললেন : ওটা ক্লোরিন গ্যাস। এই গ্যাসটার ধর্মও বিচিত্র।—এই বলে তিনি একটা লাল জবা ফুল জলে ভিজিয়ে গ্যাসজারের মুখের ঢাকনা সরিয়ে ক্লোরিন গ্যাসের মধ্যে

ফেলে দিলেন। তারপর বললেন, একটু বাদেই দেখতে পাবেন—ক্লোরিন কি অঘটন ঘটায়।

জাদুকর এরপর গ্যাসজারের ওপরে তাঁর জাদুদণ্ডটা ঘোরাতে লাগলেন। আমাদের দৃষ্টি কিন্তু তখন ঐ জবা ফুলটির দিকে। লক্ষ্য করলাম যে জবা ফুলটি ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। একটু বাদেই জবার লাল রঙ ম্যাজিকের মতো উবে গেলো।

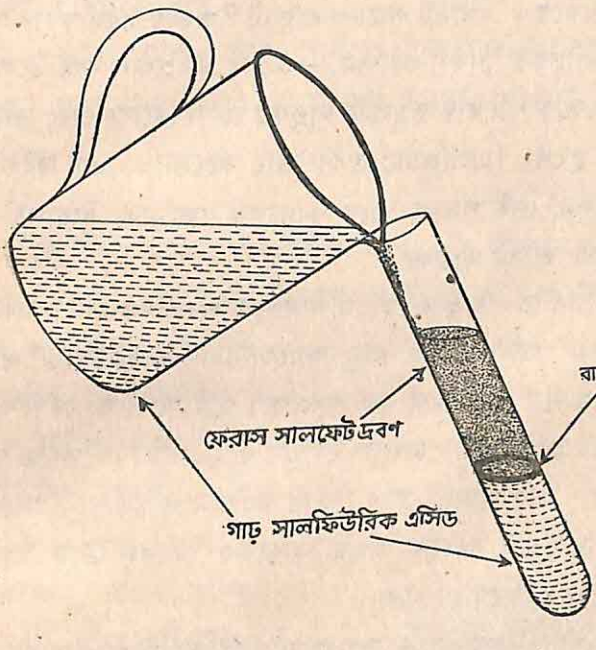
ক্লোরিন গ্যাসের বিরঞ্জন ধর্ম দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জাদুকর বললেন, মজার ব্যাপার এই যে, সব রঙিন জিনিসকেই ক্লোরিন গ্যাস বিরঞ্জিত করতে পারে না। পারে শুধু জৈব রঙকে বিরঞ্জিত করতে। তাছাড়া শুকনো জিনিসকেও ক্লোরিন বিরঞ্জিত করতে পারে না। তাইতো ভেল্‌কি দেখাবার আগে লাল জবা ফুলটাকে আমি জলে ভিজিয়ে নিয়েছিলাম।

● সহযোগী জাদুকর মিস্টার ওয়াই এরপর আমাদের বাদামী রিং-এর ভেল্‌কি দেখিয়ে প্রচুর আনন্দ দিলেন।

প্রথমে তিনি একটি পরীক্ষা-নলে সোডিয়াম নাইট্রেট নামে একটি রাসায়নিক দ্রব্য নিলেন। জল ঢেলে ঐ লবণটি গুললেন। ওই দ্রবণে তিনি সদ্য-তৈরি ফেরাস সালফেটের জলীয় দ্রবণ ঢাললেন। এই ভাবে যে মিশ্র দ্রবণ পাওয়া গেলো তাতে জাদুকর অন্য একটি পরীক্ষা-নল থেকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ধীরে ধীরে ঢাললেন। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ভারী বলে তা দ্রবণের নীচে জমা হলো এবং অ্যাসিড ও দ্রবণের সংযোগস্থলে বাদামী রঙের একটি বলয় (রিং) সৃষ্টি হলো।

মিস্টার ওয়াই বললেন, এই পরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করে প্রধানত দু'টি জিনিসের ওপর। প্রথমতঃ রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ঠিক ঠিক পরিমাণে নেওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ অ্যাসিড ঢালার সময় দ্রবণসমেত পরীক্ষা-নলটিকে ঘিরে রাখা চাই। তৃতীয়তঃ দ্রবণ আছে যে পরীক্ষা-

নলে, তার গা বেয়ে ধীরে ধীরে অ্যাসিড ঢালা চাই, এগুলি ঠিক মতো করতে না পারলে বাদামী রঙের বলয় বা রিং সৃষ্টি হবে না। ভেল্‌কি দেখাতে গিয়ে জাদুকরকে অপ্রস্তুত হতে হবে।



● পরীক্ষা-নলে আয়না!

—হ্যাঁ, পরীক্ষা-নলকেও রসায়ন-বিজ্ঞানের দৌলতে আয়নায় পরিণত করা যায়।

—এই বলে মিস্টার ওয়াই একটি কাচের পরীক্ষা-নল নিয়ে সেটাকে প্রথমে লঘু অ্যাসিড, পরে ক্ষার ও সবশেষে জল দিয়ে ভাল ভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর একটা বীকারে একশো মিলিলিটার জল নিয়ে তাতে আগে থাকতে ওজন করা সাড়ে বারো গ্রাম সিলভার নাইট্রেট লবণ গুললেন। আর একটা বীকারে একশো মিলিলিটার জল নিয়ে তাতে সাড়ে বত্রিশ গ্রাম 'সোডিয়াম পটাসিয়াম টারট্রেট নামক লবণ গুললেন।

এরপর ঐ দ্রবণ দু'টি পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়ে পঞ্চান্ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় স্পিরিট ল্যাম্পে গরম করতে লাগলেন, আমরা লক্ষ্য করলাম যে গরম করার সময় থার্মোমিটারের বাল্বটি তরলে ডোবানো রয়েছে। মিনিট পাঁচেক ধরে ঐ উষ্ণতায় গরম করার পর দ্রবণটিকে জাদুকর ঠাণ্ডা করলেন।—একটা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হলো। তার ওপর থেকে পরিষ্কার তরলটা জাদুকর ঢেলে নিলেন এবং তাতে জল ঢেলে দু'শো মিলিলিটার দ্রবণ তৈরি করলেন। এই দ্রবণ যে পাত্রে রাখলেন, সেই পাত্রের গায়ে কাগজের লেবেলে ইংরাজী A অক্ষরটি লিখে দিলেন জাদুকর।

এরপর মিস্টার ওয়াই ব্যরো মিলিলিটার জলে দেড় গ্রাম সিলভার নাইট্রেট লবণ গুলে তাতে লঘু অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ ঢালতে লাগলেন। প্রথমে যে অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হলো তা বেশী করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ঢালায় দ্রবীভূত হয়ে গেলো। তাতে জল ঢেলে দু'শো মিলিলিটার দ্রবণ তৈরি করলেন জাদুকর। আগের মতো এই দ্রবণযুক্ত পাত্রের গায়ে কাগজের লেবেল এঁটে তাতে ইংরাজী B অক্ষর লিখে দিলেন।

মিস্টার ওয়াই তারপর A দ্রবণের সঙ্গে B দ্রবণটি মেশালেন এবং ঐ মিশ্র দ্রবণ আগে থাকতে পরিষ্কার করা পরীক্ষা-নলে ঢাললেন। পরীক্ষা-নলটিকে জলপূর্ণ একটি বীকারে যতদূর সম্ভব খাড়াভাবে বসিয়ে বীকারের জলকে গরম করতে লাগলেন, আমাদের বললেন হাততালি দিতে।

আমরা হাততালি দিতে লাগলাম, আর জাদুকর তাঁর জাদুদণ্ডটা পরীক্ষা-নলের ওপরে ঘোরাতে লাগলেন।

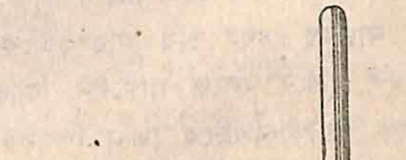
কয়েক মিনিট পরে জাদুকর পরীক্ষা-নলটিকে বীকারের গরম জল থেকে তুললেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম যে পরীক্ষা-নলটি সুন্দর আয়নায় পরিণত হয়েছে। কী সুন্দর চক্‌চক্‌ করছে!

মিস্টার ওয়াই বললেন, পরীক্ষা-নলের ভেতরের দিকের গায়ে

রূপার প্রলেপ পড়ায় ওটা আয়নায় পরিণত হয়েছে। ঘুরে ঘুরে আমাদের মুখের সামনে সেই আয়নাটি এনে তিনি দেখাতে লাগলেন। আমি সেই উত্তল আয়নায় আমার মুখের বিকৃত প্রতিবিম্ব দেখে হেসে উঠলাম হো-হো করে।

—বাবা বললেন, আয়না সমতল না হলে তাতে হুবহু প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। উত্তল বা অবতল আয়নায় প্রতিবিম্ব বিকৃতই হয়ে থাকে।

● বাবার কথা ফুরোতে না ফুরোতেই তাঁবুর মধ্যে 'আগুন-আগুন' বলে সোরগোল শুরু হয়ে গেলো। তাকিয়ে দেখি—সত্যিই আগুন জ্বলছে একটা তার জালির ওপরে।



জাদুকর অ্যাসবেস্টস মাখানো একটা তার জালির ওপরে কয়েক টুকরো আয়োডিনের দানা রেখেছিলেন। তারপর জল ভর্তি একটা বোতল থেকে এক টুকরো ফসফরাস চিমটা দিয়ে তুলে এনে আয়োডিনের ওপর ফেলতেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে।

জাদুকর বললেন, ভয় পাবেন না। এটাও রসায়নের একটা ভেল্কি। ফসফরাস ও আয়োডিন এক সঙ্গে রাখলেই আগুন জ্বলে ওঠে। ফসফরাসকে বাতাসের সংস্পর্শ রাখলেও তার দহন হয়। তাই এই মৌলিক পদার্থটিকে সর্বদাই জলের তলায় ডুবিয়ে রাখা হয়।

● ছেলেবেলায় আমরা লুকোচুরি খেলতাম। একজন চোর সেজে লুকোতাম। বাদ বাকি সবাই তাকে খুঁজে বের করবার জন্যে ঘরের আনাচে-কানাচে, গাছের আড়ালে কিংবা অন্য কোন গোপন স্থানে ছুটোছুটি করে বেড়াতাম। তারপর চোর যখন ধরা পড়তো, তখন আমাদের সে কি উল্লাস !

রঙকেও অমনি লুকোচুরি খেলানো যায়।

—এই কথা বলে জাদুকর একটা পরীক্ষা-নলে কিছুটা বোরাক্স আর ফেনপ্থ্যালিনের দ্রবণ ঢাললেন। অমনি দ্রবণটা গোলাপী রঙ ধারণ করলো।

জাদুকর এরপর ঐ পরীক্ষা-নলে একটু গ্লিসারিন ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী রঙটা গেলো অদৃশ্য হয়ে।

জাদুকর তখন তাঁর জাদুদণ্ডটাকে পরীক্ষা-নলের ওপরে বার কয়েক ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন, 'ফিরে আয়, ফিরে আয়'। কথার ফাঁকে পরীক্ষা-নলটিকে তিনি স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় একটু গরম করলেন। অমনি জাদুকরের ডাকে সাড়া দিয়ে গোলাপী রঙ আবার ফিরে এলো। আরও অবাক কাণ্ড, পরীক্ষা-নলটিকে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করতেই গোলাপী রংটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেলো।

রঙের এই লুকোচুরি দেখে আমরা আনন্দে হাততালি না দিয়ে পারলাম না।

● জাদুকরের টেবিলের ওপর কয়েক টুকরো কাগজ ইতস্তত ছড়ানো ছিল। জাদুকর মিস্টার এক্স এক একটা কাগজের টুকরোয় তাঁর জাদুদণ্ড ছোঁয়াতে লাগলেন। আর দুম্‌দুম্‌ করে শব্দ হতে লাগলো। মনে হলো যেন পট্‌কা ফাটছে।

জাদুকর বললেন, পটকাই বটে। তবে এ পটকা খুবই স্পর্শকাতর পটকা। সামান্য স্পর্শেই এর বিস্ফোরণ ঘটে।

—এই বলে মিস্টার এক্স তিনটি বা চারটি আয়োডিনের দানা একটা খলে নিয়ে নুড়ি দিয়ে পিষে মিহিভাবে গুঁড়ো করে নিলেন।

পরিষ্কার ও শুকনো একটা পরীক্ষা-নলে সেই গুঁড়ো নিয়ে জাদুকর তার মধ্যে এক চামচ লাইকার অ্যামোনিয়া ঢাললেন। কিছুক্ষণ (আধ ঘণ্টা সময় দিলে ভাল হয়) ঐ মিশ্রণকে অমনি ভাবে একটি টেস্টটিউব স্ট্যাণ্ডে স্থিরভাবে রেখে দিলেন।

বাদামী রঙের একটা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হলো। নির্দিষ্ট সময় পরে জাদুকর দ্রবণটি ফিল্টার কাগজের সাহায্যে ছেঁকে নিলেন। তখন অধঃক্ষেপটি সঞ্চিত হলো ফিল্টার কাগজের ওপর।—একটা আলপিনের ডগায় যতটুকু ধরে প্রায় ততটুকু করে ঐ বাদামী অধঃক্ষেপ নিয়ে জাদুকর এক এক টুকরো কাগজের ওপর রাখলেন। কাগজের ওপর ঐ অধঃক্ষেপ কণা শুকিয়ে যেতেই জাদুকর বললেন, এইবার পটকা তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে।

এরপর যতবারই তিনি এক একটি কাগজ জাদুদণ্ড দিয়ে স্পর্শ করেন ততবারই বিস্ফোরণ ঘটে ও দুম্‌দুম্ করে শব্দ হতে থাকে।

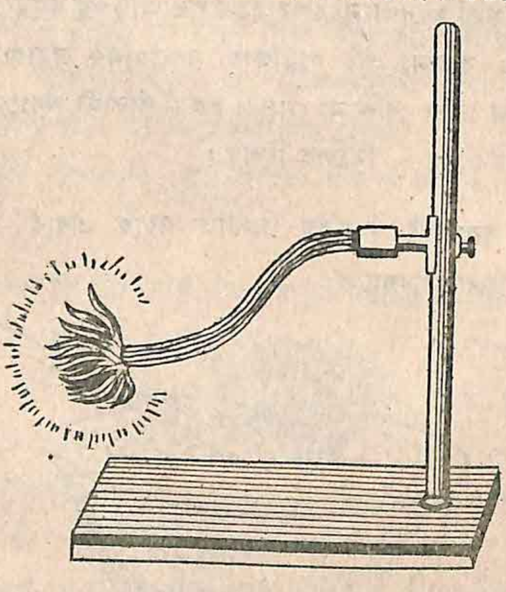
এই ভেল্‌কি দেখানো শেষ হলে পর জাদুকর আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, এই পরীক্ষায় রাসায়নিক দ্রব্যগুলির পরিমাণ কখনই যেন বেশি বেশি না নেওয়া হয়। বাদামী অধঃক্ষেপটাও বেশি নেওয়া উচিত নয়। নিলেই বিপদ!

● সহযোগী জাদুকর মিস্টার ওয়াই এবার এগিয়ে এলেন পরবর্তী খেলাটি দেখাতে।



চীনামাটির একটা বাটিতে তিনি 'কার্বন ডাইসালফাইড' নামে একটি তরল পদার্থ ঢাললেন। একটা কাচশলাকা স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনে কড়া তাপে গরম করে সেই গরম শলাকাটি তরলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। গরম শলাকার ছোঁয়ায় মুহূর্তের মধ্যে তরল কার্বন ডাইসালফাইড মৃদু আলো সহকারে জ্বলতে আরম্ভ করলো। আমরা অবাক হয়ে গেলাম।

● আগুন নেভা মাত্রই তাঁবুর মধ্যে হঠাৎ অন্ধকার নেমে এলো। আমরা ভয়ে সচকিত হয়ে উঠলাম। ভালভাবে লক্ষ্য করায় দেখলাম—কয়েকজন লোক চট্‌পট্ কার্বাইড বাতিগুলোকে নিভিয়ে দিল। 'হ্যাজাক' বাতিকে সরিয়ে নিয়ে গেলো তাঁবুর বাইরে। একটি মাত্র মোমবাতি শুধু টিম্‌টিম্ করে জ্বলতে লাগলো তাঁবুর মধ্যে। মোমবাতির সেই স্তিমিত আলোয় দেখলাম যে মিস্টার এক্স লম্বা একটা ফিতে একটা স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আটকিয়ে সেই ফিতের এক প্রান্তে

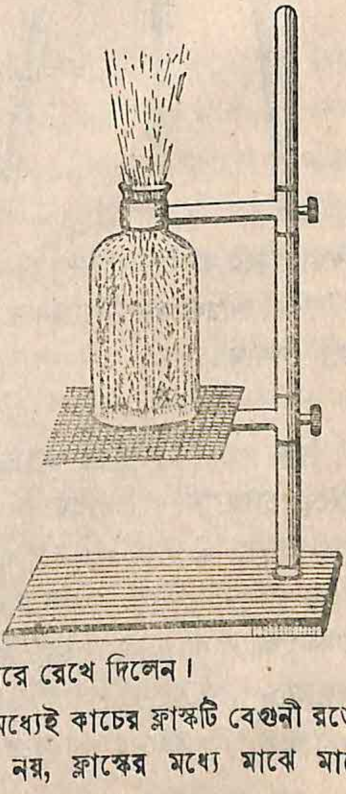


দিয়াশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন, আর অমনি শুভ্র ও উজ্জ্বল আলোয় চোখ ঝলসে গেলো।

জাদুকর বললেন, ওটা ম্যাগনেসিয়ামের ফিতা। এ ফিতা জ্বলবার সময় চোখ-ঝলসানো আলোক শিখা উৎপন্ন করে। দেওয়ালীর রাতে আপনারা অনেকেই এই রকম ম্যাগনেসিয়ামের ফিতা জ্বালিয়ে উজ্জ্বল আলোক উৎপাদন করে থাকবেন।

● ম্যাগনেসিয়াম ফিতা জ্বলে শেষ হয়ে গেলো। তাঁবু তখনও অন্ধকার। দর্শকদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলো: এবার বাতিগুলো জ্বালান।

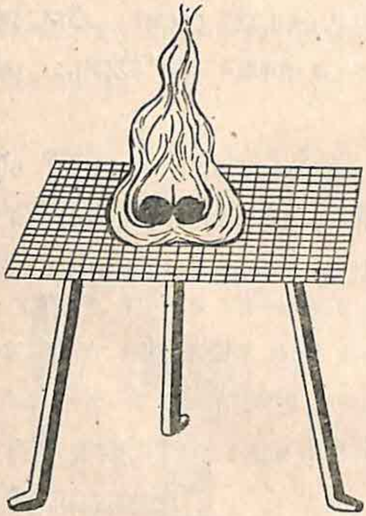
—উত্তর এলো, আর একটু অপেক্ষা করুন। অন্ধকারে চট্‌পট্ আর কয়েকটা খেলা দেখিয়ে দিই। এই বলে মিস্টার ওয়াই এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। আমরা মোমবাতির স্তিমিত আলোয় রুদ্ধ-শ্বাসে দেখতে লাগলাম জাদুকরের কাণ্ডকারখানা।



মিস্টার ওয়াই বলতে লাগলেন, আমি আধ চামচ অ্যালুমিনিয়াম ধাতু চূর্ণের সঙ্গে আধ চামচ আয়োডিন চূর্ণ মেশাচ্ছি।—একটা কাগজে ঐ মিশ্রণ তৈরি করে শুকনো একটা কাচের ফ্লাস্কে তিনি মিশ্রণটি ঢাললেন। তারপর সাত আট ফোঁটা জল দিয়ে মিশ্রণটি ভেজালেন এবং ফ্লাস্কটিকে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তারজালির ওপরে রেখে দিলেন।

—কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই কাচের ফ্লাস্কটি বেগুনী রঙের ধোঁয়ায় ভরে গেলো। শুধু তাই নয়, ফ্লাস্কের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোর ফুলকি চিক্‌চিক্ করে জ্বলতে লাগলো।

● এই খেলাটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জাদুদণ্ড নাড়তে নাড়তে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন জাদুকর। তিনি বললেন, দিয়াশলাই ব্যবহার না করে কিংবা আগুনের সংস্পর্শ না ঘটিয়েই আমি আগুন জ্বালাবার কৌশল আপনাদের দেখাব।—এই বলে তিনি এক চামচ চিনির সঙ্গে এক চামচ পটাসিয়াম ক্লোরেটের গুঁড়ো মেশালেন। সেই মিশ্রণকে অ্যাসবেস্টস-লেপা একটা তারজালির ওপর রাখলেন। তারপর কাচের শলাকা দিয়ে এক ফোঁটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঐ মিশ্রণের ওপর ফেললেন,—অমনি মিশ্রণটি দাউদাউ করে গাঢ় লাল রঙের আলোকশিখা বিস্তার করে জ্বলতে লাগলো।



বিনা অগ্নিসংযোগে আগুন জ্বালাবার কৌশল দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম।

● এরপর জাদুকর একটা বড় ও মোটা পরীক্ষা-নলে সাদা গুঁড়ো ঢাললেন। স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় পরীক্ষা-নলটিকে খুব গরম করে ঐ সাদা গুঁড়োকে গলালেন। তারপর পরীক্ষা-নলের মধ্যে খানিকটা কালো গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেন। অমনি অন্ধকার তাঁবুটা উজ্জ্বল গোলাপী রঙের আভায় ভরে উঠলো। আরও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে—গলে যাওয়া পদার্থটির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া কালো পদার্থের কণাগুলো এক ধরনের শব্দ করে নেচে বেড়াতে লাগলো।

জাদুকর মিস্টার এক্স বললেন, সাদা গুঁড়োটা হলো পটাসিয়াম

নাইট্রেট আর কালো গুড়োটা হলো কাঠকয়লা চূর্ণ। বেশী তাপে পটাসিয়াম নাইট্রেট যৌগটা ভেঙে যায় এবং তার থেকে অক্সিজেন গ্যাস বেরোয়। সেই অক্সিজেনে কার্বনের (কাঠ কয়লা চূর্ণের) দহনের সময় পট্‌পট্‌ শব্দ হয়। আর সাদা গুঁড়োটা পটাসিয়াম ধাতুর লবণ বলে বেশী তাপে উজ্জ্বল গোলাপী আভাযুক্ত লাল আভার সৃষ্টি করে।

● এই খেলাটি শেষ হতেই জ্বেলে দেওয়া হলো তাঁবুর ভেতর-কার কার্বাইড বাতিগুলি। মোমবাতিটি নিভিয়ে দিয়ে তাঁবুর বাইরে থেকে 'হ্যাজাক' বাতি দুটিও আনা হলো। অনেকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে থেকে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আলো জ্বলায় আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

জাদুকর মিস্টার এক্স বললেন, আপনারা কেউ বহুরূপী তরল দেখেছেন কি?—একই তরল পদার্থ কখনো লাল, কখনো নীল, কখনো বা অন্য রঙ ধারণ করতে পারে—এমন কথা শুনেছেন কি?

—যদি এমন তরল না দেখে থাকেন বা না শুনে থাকেন এমন তরলের কথা, তবে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন। —এই বলে জাদুকর টেবিলের ওপর পাশাপাশি দু'টি কাচের গেলাস রাখলেন। কাচের একটি জলপাত্র থেকে খানিকটা জল যেই না তিনি প্রথম গেলাসে ঢাললেন, অমনি তা লাল হয়ে গেলো। তারপর সেই একই জলপাত্রের জল যেই না তিনি দ্বিতীয় গেলাসে ঢাললেন, অমনি তা দুধের মতো সাদা হয়ে গেলো।

সহযোগী জাদুকর মিস্টার ওয়াই বললেন, রসায়নের কাণ্ড-কারখানাই এই রকম। আমরা যেটাকে জল বলে দেখালাম, তা জলের মতো স্বচ্ছ তরল হলেও জল নয়। ওটা হচ্ছে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ওতে আমরা মিশিয়েছি কয়েক ফোঁটা 'ফেনপ্‌থ্যালিন'।

প্রথম গেলাসে আমরা আগে থাকতে রেখে দিয়েছিলাম কস্টিক সোডার একটুখানি জলীয় দ্রবণ। গেলাসের তলায় পড়ে থাকা ঐ স্বচ্ছ দ্রবণটুকু আপনাদের নজর এড়িয়ে গেছে। ফেনপ্থ্যালিন মেশানো অ্যাসিড দ্রবণ প্রথম গেলাসের ক্ষার দ্রবণের (কস্টিক সোডা দ্রবণ) সংস্পর্শে আসা মাত্রই লাল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় গেলাসে, আমরা রেখেছিলাম সামান্য 'হাইপো' (সোডিয়াম থায়োসালফেট) দ্রবণ। স্বচ্ছ বলে ঐ দ্রবণটাও আপনাদের নজর এড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় গেলাসের ঐ 'হাইপো' দ্রবণে অ্যাসিড দ্রবণ ঢালা মাত্রই গন্ধকের অতি সূক্ষ্ম কণা উৎপন্ন হয়। ফলে দ্বিতীয় গেলাসের তরল অনেকটা দুধের মতো সাদা রঙ ধারণ করে।

● মিস্টার ওয়াই বলে চলেন, দুধকে কি আপনারা কেউ জলে পরিণত করতে পারেন?—দর্শকদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে ওঠে, 'তাই কি কখনও পারা যায়'?

'আপনি না পারলেও আমি পারি। আর পারি এই রসায়নের দৌলতেই'।—এই বলে সহযোগী জাদুকর আমাদের একটা কাচপাত্র দেখালেন—যার মধ্যে দুধের মতো সাদা তরল পদার্থ রয়েছে। এরপর জাদু যন্ত্রটাকে ঐ পাত্রের ওপর বার কয়েক ঘুরিয়ে নিয়ে একটা বোতল থেকে কয়েক ফোঁটা স্বচ্ছ তরল ঐ দুধে ফেলতেই মুহূর্তের মধ্যে সেই দুধ জলের মতো স্বচ্ছ তরলে পরিণত হলো।

মিস্টার ওয়াই এই ভেল্‌কির রহস্যটা বোঝাতে গিয়ে বললেন, দুধ বলে যেটা আপনাদের দেখালাম, তা মোটেই দুধ নয়। আসলে ওটা হচ্ছে সোডা অর্থাৎ সোডিয়াম কার্বনেটের এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণের মিশ্রণ।—রঙ দুধের মতোই সাদা। বোতল থেকে যে স্বচ্ছ তরল ওতে ঢাললাম—তা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

দুধের মতো সাদা দ্রবণে খড়িমাটি (যার রাসায়নিক নাম

ক্যালসিয়াম কার্বনেট) থাকে। সোডা ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ঐ খড়িমাটি সৃষ্টি হয় এবং সাদা রঙের ঐ খড়িমাটির উপস্থিতির জন্যেই তরলটা দুধের মতো সাদা হয়। সাদা ঐ তরলে অ্যাসিড ঢালতেই খড়িমাটি অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়, ফলে তরলটি জলের মতো স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হয়।

● 'বহুরূপী তরলের আর কয়েকটা খেলা দেখুন আপনারা।' —এই বলে জাদুকর মিস্টার এক্স একটা কাচের বাটিতে জল নিয়ে তাতে খানিকটা সাদা গুঁড়ো ফেলে গুলে নিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বললেন,—ঐ সাদা গুঁড়োটার নাম 'ফেনপ্‌থ্যালিন'।

একটা কাচের গেলাসে সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট) দ্রবণ নিয়ে তাতে কিছুটা ফেনপ্‌থ্যালিন দ্রবণ ঢালতেই গেলাসের ক্ষার দ্রবণটা লাল হয়ে গেলো। তারপর সেই লাল তরলে যেই না মিস্টার এক্স কিছুটা 'টারটারিক অ্যাসিড' ঢাললেন—অমনি লাল তরলটা আবার স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হয়ে গেলো।—দর্শকদের মধ্যে থেকে কে যেন একজন বলে উঠলো, ভারী মজার ব্যাপার তো!

● 'আরও মজা আছে, দেখুন।'—এই বলে জাদুকর একটা বড় বীকারে পাঁচশো মিলিলিটার কোহল (অ্যালকোহল) নিয়ে তাতে তিন গ্রাম আন্দাজ কোবাল্টাস ক্লোরাইড লবণ দ্রবীভূত করলেন। তখনই কোহলের রঙটা গোলাপী হয়ে গেলো। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে আপনা থেকেই নীল ও আরও পরে গোলাপী হলো।

ত্রিপদ স্ট্যাণ্ডের ওপর একটা অ্যাসবেস্টস বোর্ড বসিয়ে তার ওপর বীকারটি রেখে জাদুকর স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে বীকারের তরলকে একটু গরম করলেন। গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোলাপী রঙের তরলটা নীল হয়ে গেলো। স্ট্যাণ্ড থেকে নামিয়ে তরলকে ঠাণ্ডা করতেই আবার তা গোলাপী হলো।

● সহযোগী জাদুকর বললেন, রসায়নের দৌলতে এমনি আরও মজার রঙের খেলা আমরা দেখাতে পারি।—এই বলে জামার পকেট থেকে তিনি এক টুকরো নীল কাগজ বের করলেন, তারপর কাগজটাকে একটা অ্যাসিডে যেই না ডোবালেন, অমনি কাগজটা লাল হয়ে গেলো। তারপর সেই লাল কাগজটাকে জাদুকর যেই না ক্ষার দ্রবণে (কস্টিক সোডা দ্রবণে) ডোবালেন, অমনি সেটা আবার আগেকার নীল রঙ ফিরে পেলো।

মিস্টার ওয়াই বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। বললেন, 'লিটমাস' নামে একটা উদ্ভিদজাত রাসায়নিক দ্রব্য আছে। ব্লটিং কাগজ এই রাসায়নিক দ্রব্যের দ্রবণে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলেই 'লিটমাস কাগজ' পাওয়া যায়। নীল লিটমাস দ্রবণ বা কাগজ অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসলেই লাল হয়ে যায়। কিন্তু লাল লিটমাস দ্রবণ বা কাগজ ক্ষারের সংস্পর্শে এলেই নীল হয়ে যায়।

•

● জাদুকর মিস্টার এক্স এরপর র‍্যাকের থেকে নীল রঙের কয়েকটি স্ফটিক (ক্রিস্ট্যাল) এনে আমাদের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি জিনিস বলতে পারেন ?—ছেলেবেলা থেকেই আমি বেশ সপ্রতিভ। তাই সংকোচ না ক'রে চটপট্ জবাব দিলাম, "মনে হচ্ছে ওটা তুঁতে"।

জাদুকর বললেন : হ্যাঁ, তুঁতেই বটে। এর রাসায়নিক নাম 'কপার সালফেট'। তুঁতের এই দানা কটি আমি একটা পরীক্ষা-নলে নিয়ে বেশি করে জল দিয়ে গুলবো। তারপর সেই দ্রবণের রঙটা কেমন হবে তা আপনারা দেখবেন।

দ্রবণ তৈরি করে জাদুকর আমাদের দেখালেন।—দেখলাম, দ্রবণটি ফিকে নীল রঙের।

এরপর জাদুকর একটা বোতল হাতে নিয়ে বললেন, এতে

আছে 'লাইকার অ্যামোনিয়া'।—এই বলে কয়েক ফোঁটা লাইকার অ্যামোনিয়া তিনি তুঁতের ঐ লঘু দ্রবণে ঢাললেন। আর অমনি ফিকে রঙের দ্রবণটি গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করলো।

● জাদুকর এরপর যে খেলাটি দেখাবেন বলে ঘোষণা করলেন, তার নাম 'রক্তাক্ত হাত'।

টেবিল থেকে একখণ্ড সাদা মসলিন বস্ত্র নিয়ে জাদুকর সেটাকে 'সোডিয়াম স্যালিসিলেট' দ্রবণে ডুবিয়ে ভিজিয়ে নিলেন। মিস্টার ওয়াই অর্থাৎ সহযোগী জাদুকর পাশেই ছিলেন। তিনি ভিজে মসলিন বস্ত্রখণ্ডটি একটি দড়ির ওপর মেলে দিয়ে পাখার বাতাস ক'রে সেটাকে শুকাতে লাগলেন। জাদুকর এদিকে টেবিলের ওপর একটি কাচের গেলাসে 'ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেট' নামক একটা রাসায়নিক দ্রব্যের দ্রবণ তৈরি করলেন। জলের মতোই বর্ণহীন ও স্বচ্ছ সে দ্রবণ।

সেই দ্রবণে হাত ভেজালেন জাদুকর। এদিকে মসলিন বস্ত্রখণ্ডটি ততক্ষণ শুকিয়ে গেছে। জাদুকর তাঁর ভিজে হাত ঐ মসলিন বস্ত্রখণ্ডে মুছলেন।—কী আশ্চর্য, রক্তের মতো গাঢ় লাল রঙ ফুটে উঠলো সেই সাদা বস্ত্রের গায়ে।

এই ভেল্‌কির রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাদুকর বললেন, আমার হাতে আর মসলিন বস্ত্রখণ্ডের গায়ে লেগে থাকা রাসায়নিক দ্রব্য দু'টির মধ্যে বিক্রিয়া ঘটেই রক্তের মতো লাল রঙের উৎপত্তি হয়েছে। —বিশ্বাস করুন, আমার হাত থেকে এক বিন্দুও রক্তপাত হয়নি। —এই বলে তিনি নিজের হাতখানি মেলে ধরলেন আমাদের সামনে নাটকীয় ভঙ্গীতে।

● সহযোগী জাদুকর মিস্টার ওয়াই এরপর র‍্যাক থেকে দু'টি শিশি টেনে বের করলেন। শিশির গায়ের লেবেলের লেখা পড়ে

জানলাম—একটিতে আছে কোবাল্ট ক্লোরাইড এবং অপরটিতে আছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড।

দু'টি আলাদা পাত্রে উনি—প্রতিটি রাসায়নিক দ্রব্যের জলীয় দ্রবণ তৈরি করলেন। তারপর একটি দ্রবণকে অপরটির সঙ্গে মিশিয়ে তাতে জল ঢেলে দেখালেন যে মিশ্র দ্রবণের রঙ হয়েছে ফিকে লাল।

এবার মিস্টার ওয়াই একখণ্ড ব্লটিং কাগজ সেই দ্রবণে ডুবিয়ে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলেন। কাগজটিকে প্রায় বর্ণহীন বলেই মনে হলো। কিন্তু যেই না স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে তার শিখার ওপরে ওটাকে ধরে চাপ দিলেন মিস্টার ওয়াই,—অমনি ওর রঙ গেলো বদলে। আগে ছিল প্রায় বর্ণহীন। এখন হলো উজ্জ্বল সবুজ। তাপ স্পর্শকাতর কাগজের রঙ বদল আমাদের মুগ্ধ করলো।

● সহযোগী জাদুকর মিস্টার ওয়াই জাদুকর মিস্টার এক্স-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আমার এই বন্ধুটি বড় ভাল ছেলে। ওঁর কোন নেশাপত্তর নেই। আমি কিন্তু ওঁর মতো সুবোধ বালকটি নই। সিগারেটের নেশা আছে আমার।

—এই বলে নিজের পকেট থেকে একটি সিগারেট বের করলেন তিনি। তারপর দর্শকদের উদ্দেশে বললেন, আপনারা সিগারেট ধরান দিয়াশলাই দিয়ে। আমি কিন্তু সিগারেট ধরাতে পারি বরফ দিয়ে। বিশ্বাস না হয় তো দেখুন।

টেবিলের ওপর চীনামাটির একটি ডিশ ছিল। চটের থলিতে কাঠের গুঁড়োর মধ্যে ঢেকে রাখা একখণ্ড বরফ তুলে এনে মিস্টার ওয়াই সেটিকে ঐ ডিশে রাখলেন। তারপর ডিশটি আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন তো—এটা বরফ না অন্য কিছু। আমরা অনেকেই হাত দিয়ে দেখলাম—ওটা বরফের মতোই ঠাণ্ডা এবং হুবহু বরফের মতোই দেখতে।

মিস্টার ওয়াই বাঁ হাতে সিগারেটটিকে ধরে তার ওপর জাদুদণ্ড একবার ঘুরিয়ে নিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলেন : "ফুট-ফট-ছট্-আ
সিগারেট ধরে যা"।

মন্ত্রপাঠ শেষ হ'তেই একটা বোতল থেকে চিমটা দিয়ে কি যেন একটা জিনিস বের করলেন মিস্টার ওয়াই। তারপর সিগারেটের একপ্রান্তে চট্‌পট্ সেটা গুঁজে দিয়ে সিগারেটের সেই প্রান্ত তিনি বরফে ঠেকালেন। মুহূর্তের মধ্যেই সিগারেট জ্বলে উঠলো। অবাক কাণ্ডই বটে !

মিস্টার ওয়াই বুঝিয়ে দিলেন—রহস্যটা কোথায়। তিনি বললেন, বরফে ঠেকাবার ঠিক আগের মুহূর্তে সিগারেটের একপ্রান্তে আমি খুব ছোট্ট (একটা আলপিনের ডগার তিন গুণ আকারের) এক কুচি পটাসিয়াম ধাতু ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। বরফে ছোঁয়ানো মাত্রই পটাসিয়াম ধাতুখণ্ড বরফের গায়ের জলের সংস্পর্শে এসে তার সঙ্গে বিক্রিয়া ক'রে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত করে। বিক্রিয়া খুব তীব্রভাবে ঘটে বলে তাতে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। আর সেই তাপেই মুক্ত হাইড্রোজেন গ্যাসে আগুন জ্বলে ওঠে। সে আগুনে সিগারেটও জ্বলে ওঠে।

তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার। পটাসিয়াম ধাতু বাতাসের জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে। তাই সর্বদা একে বোতলে কেরোসিন তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়। তাছাড়া হাত দিয়ে ধাতুটিকে স্পর্শ করতে নেই। সর্বদা চিমটা দিয়ে ধরতে হয়।

● এই খেলা শেষ হওয়া মাত্রই তাঁবুর মধ্যে হঠাৎ সাপুড়ের বাঁশীর শব্দ শোনা গেলো। আমরা সবাই বাঁশীর শব্দে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। এদিকে-ওদিকে চাইছি—কে বাঁশী বাজায়, তা দেখবার

জন্যে। এমন সময় পিছনের দরজা দিয়ে কে একজন ভেতরে ঢুকলো। পরনে তার বিচিত্র পোশাক। সর্বাঙ্গে রঙ মাখা সেই লোকটির মাথায় একটি সাপের ঝাঁপি ও হাতে সাপুড়ের বাঁশী। বুঝতে বাকি রইলো না যে এই লোকটিই এতক্ষণ বাঁশী বাজাচ্ছিল। লোকটিকে দেখে আমার মনে পড়ে গেলো সার্কাসের 'জোকারের' কথা। লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ ও হাঁটা-চলা জোকারের মতোই।

লোকটি আমাদের সামনে এসে সাপের ঝাঁপিটি মাথা থেকে নামিয়ে টেবিলের ওপর রেখে অঙ্গভঙ্গী করে বললো, সাপের খেলা দেখবেন—বাবুমশাইরা—সাপের খেলা?

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেলো—এত লোকের মাঝে সাপের খেলা? যদি সাপে কাটে কাউকে?

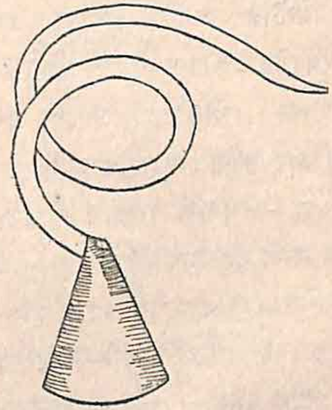
লোকটি বললো, ভয় পাবেন না বাবুমশাইরা। এ জ্যান্ত সাপ নয়। তবুও জ্যান্ত সাপের মতোই এর চালচলন।

জাদুকর এতক্ষণ অদূরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলেন। এবার তিনি এগিয়ে এসে বললেন, এ লোকটি আমাদেরই একজন। এর নাম মিস্টার জেড। রসায়নের তেল্কি দেখাতে ইনিও সিদ্ধহস্ত। তার প্রমাণ আপনারা পাবেন।

মিস্টার জেড এবার তাঁর সাপের ঝাঁপি খুললেন। আমরা দেখলাম—তার ভেতরে সাপটাপ কিছুই নেই, আছে মাত্র তিনটি শিশি। মিস্টার জেড নাটকীয়ভাবে আমাদের সামনে ঐ শিশি তিনটি তুলে ধরলেন। প্রতিটি শিশির গায়েই কাগজের লেবেল আঁটা। একটায় লেখা আছে 'মারকিউরিক থায়োসায়ানেট', অপরটার গায়ে লেখা আছে 'আঠা' এবং তৃতীয় শিশিটির গায়ে লেখা আছে 'জল'।

দর্শকদের মধ্যে থেকে এক ফোচকে ছোকরা বলে উঠলো: আরে, সাপের খেলা দেখাবে না হাতি। জেড সাহেব স্রেফ ধাপ্পা দিচ্ছে আমাদের। তার পাশের বন্ধুটি বললে, দেখাই যাক্ না জোকার সাহেবের কেরামতিটা।

—এমনি সব মন্তব্য যখন শুরু হলো তখন জেড সাহেব মুখ খুললেন। বললেন, দেখুন বাবুমশাইরা, আমি এই তিনটে শিশির মালমসলা দিয়েই সাপ বানাবো।



—এই বলে একটা কাচের বাটিতে তিনি খানিকটা মারকিউরিক থায়োসায়ানেট ঢাললেন। তার সঙ্গে খানিকটা আঠা মিশিয়ে জল দিয়ে নেড়ে আঠালো লেই বানালেন। তারপর সেটাকে হাত দিয়ে টিপে টিপে পিরামিডের আকৃতি দিলেন।

দর্শকদের মধ্যে থেকে কে যেন ফোড়ন কাটলো, সাপ না পিরামিড ওটা?—জেড সাহেব চুপ করে থাকার পাত্র নন। চটপট তিনিও জবাব দিলেন; হ্যাঁ, ঐ পিরামিড থেকেই বেরুবে সাপ।—এই বলে একটা দিয়াশলাই কাঠি জ্বেলে ঐ পিরামিডে আগুন ধরিয়ে দিলেন। পিরামিড জ্বলতে লাগলো। যতই জ্বলে ততই তার থেকে ছাই বেরোয়। সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো ছাই।

গোটা পিরামিড পুড়ে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। তার জায়গায় পড়ে রইলো কুণ্ডলী পাকানো সাপের আকৃতিযুক্ত ছাই!

জেড সাহেব বেশ গর্ব ভরেই বলে উঠলেন, বাবুমশাইরা, এখন আপনারাই দেখুন—এটা সাপ কিনা। এ সাপের নাম কি জানেন? —এর নাম 'ফ্যারাও-এর সাপ'।

● জেড সাহেব চলে যেতেই এগিয়ে এলেন সহযোগী জাদুকর মিস্টার ওয়াই। তিনি বললেন, রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্য নিয়ে আমরা এমন সব কাণ্ড করতে পারি, যা ভাবতেও অবাক লাগে।—এই বলে তিনি টেবিলের ওপর একটি সরল তড়িৎকোষ

রাখলেন। ঐ তড়িৎকোষের দুই মেরুপ্রান্তে দু'টি অন্তরিত তামার তার লাগালেন। তার দুটির অপর দুই প্রান্ত খোলা রইলো।

মিস্টার ওয়াই তারপর একটা কাচের বীকারে সোডিয়াম সালফেটের জলীয় দ্রবণ তৈরি ক'রে তাতে কয়েক ফোঁটা ফেনপ্‌থ্যালিন মেশালেন। বীকারের দ্রবণে একখণ্ড ব্লটিং কাগজ ডুবিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে তার দুটির খোলা প্রান্ত দিয়ে সেই কাগজটির দুই পিঠ স্পর্শ করলেন।—অবাক বিস্ময়ে আমরা দেখলাম যে কাগজের এক পিঠে সুন্দর লাল রঙ ফুটে উঠেছে।—মিস্টার ওয়াই বললেন: ব্যাটারির নেগেটিভ মেরুপ্রান্তের সঙ্গে যুক্ত তার কাগজের যে প্রান্তকে স্পর্শ করেছে সেই প্রান্তটিই রঙিন হয়েছে। বিশ্বাস না হয় তো কাছে এসে দেখে যান।—এই তারটি ব্যাটারির নেগেটিভ মেরুপ্রান্তের সঙ্গে যুক্ত কিনা।

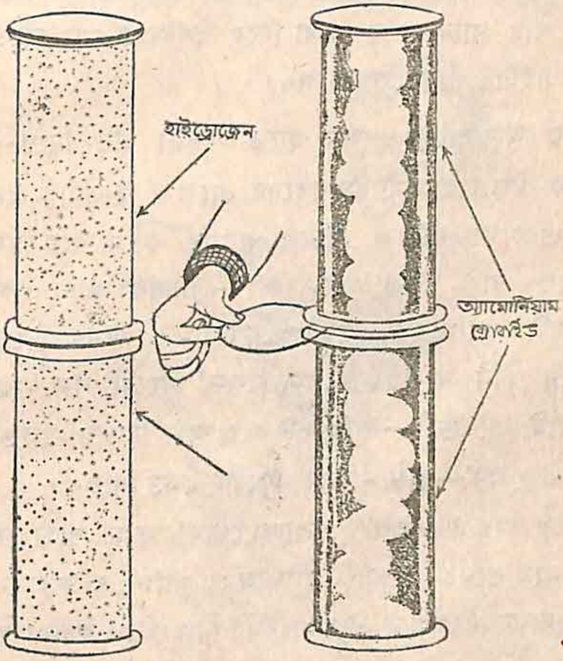
—রসায়নের দৌলতে ব্যাটারির মেরুপ্রান্ত নির্ণয় করা যে সম্ভব, তা আমি এই প্রথম জানলাম।

● জাদুকরের টেবিলের ওপর, মুখে কাচের ঢাকনা লাগানো দু'টি গ্যাস জার ছিল। গ্যাস জার দুটির গায়ে আঁটা লেবেলে প্রত্যেকটি গ্যাসের নামও লেখা ছিল।—একটির নাম অ্যামোনিয়া এবং অপরটির নাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড।

আমরা ভেবেছিলাম, গ্যাসজার দু'টি বুঝি বা শূন্য। কিন্তু জাদুকর আমাদের ভুল ভেঙে দিলেন।

তিনি অ্যামোনিয়া পূর্ণ গ্যাসজারের মুখের ঢাকনা সরিয়ে তার খোলা মুখের ওপর হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পূর্ণ গ্যাসজারটি বসালেন। তারপর সন্তর্পণে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পূর্ণ গ্যাসজারের মুখের ঢাকনাটি নিলেন সরিয়ে। দু'টি গ্যাসজার একই ম্যাপের হওয়ায় মুখোমুখি আটকে রইলো। কোথাও একটুও ফাঁক রইলো না যে

সেখান দিয়ে কোন গ্যাসজারের গ্যাস বাইরে বেরুবে কিংবা বাইরের বাতাস কোন গ্যাসজারে ঢুকবে।



একটু পরেই আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে উভয় গ্যাস-জারের ভেতরে সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হয়েছে। আরও একটু পরে দেখলাম যে, সাদা ধোঁয়া আর নেই। তার জায়গায় উভয় গ্যাস-জারের ভেতরের দিকের গায়ে পাউডারের মতো সাদা রঙের অজস্র কঠিন কণা সঞ্চিত হয়েছে।

জাদুকর বললেন, ঐ সাদা কঠিন পদার্থটা হলো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ যাকে আমরা 'নিশাদল' বলে থাকি।

বর্ণহীন দু'টি গ্যাস রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে কেমন সুন্দর সাদা কঠিন পদার্থ সৃষ্টি করেছে। 'রসায়ন-বিজ্ঞান' এমনি অনেক অঘটন ঘটাতে পারে—বললেন জাদুকর মিস্টার এক্স।

● জেড সাহেব সাপের খেলা দেখিয়ে কোথায় যে চলে গিয়েছিলেন কে জানে। এতক্ষণ বাদে আবার তাঁকে তাঁবুর মধ্যে দেখতে পেয়ে দর্শকরা সবাই উৎফুল্ল হলেন। জেড সাহেব তাঁর বিশিষ্ট ভাবভঙ্গী আর বাচনভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে দর্শকদের মন কেড়ে নিতে ওস্তাদ। এইটাই তাঁর মস্ত বড় গুণ।

এবারে জেড সাহেব এলেন হাতে একটা ছড়ি নিয়ে,—যেমন ছড়ি থাকে ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের হাতে। ছড়িখানি দোলাতে দোলাতে একসময় সেটাকে উঁচিয়ে আমার কানে ধরে বললেন: খোকা, বল দেখি 'লেড' মানে কি ?—আচমকা এমন একটা প্রশ্ন শুনে প্রথমটায় আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে দেখে উনি আবার বললেন, 'লেড' ইংরেজী শব্দ যার বানান হচ্ছে এল. ই. এ. ডি।—আমি চট্ করে বলে দিলাম 'লেড' মানে সীসা। 'গুড্ বয়'—ছড়ি নাচিয়ে বললেন জেড সাহেব।

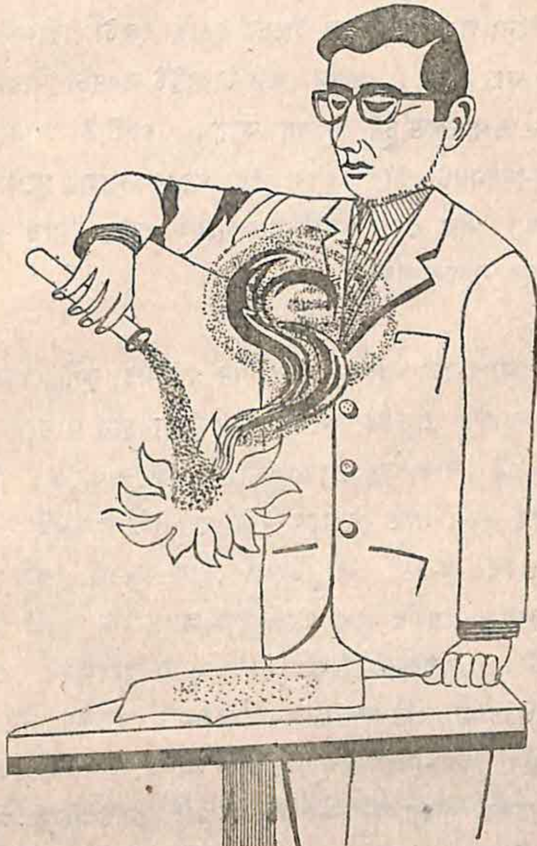
তারপর আর এক প্রশ্ন। 'আচ্ছা খোকা, তুমি পাইরোফোরিক লেড-এর নাম শুনেছ ?—আমি বললাম: আমি তো ক্লাস সেভেনএ পড়ি। রসায়ন বিজ্ঞানের ঐ সব খটমট নাম আমি কখনও শুনি নি। আপনি বরং দ্বিজুদাকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি তো কলেজে পড়েন। —এই বলে আমি আঙুল দিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিজুদাকে দেখিয়ে দিলাম।

আর যায় কোথা। জেড সাহেব দ্বিজুদাকেই প্রশ্নটা করলেন। দ্বিজুদাও গেলেন ঘাবড়ে। উনি আমতা আমতা করে শেষে হার মানলেন বিজ্ঞানের ছাত্র হ'লেও 'পাইরোফোরিক লেড' নামটা দ্বিজুদাও শোনেন নি এখন পর্যন্ত !

তখন জেড সাহেব বলতে লাগলেন; এ হচ্ছে ধাতব সীসার অতি মিহি গুঁড়ো। জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমরা এ জিনিসটি তৈরি করে নিতে পারি।—এই বলে নিজের পকেট থেকে মুখে ছিপি আঁটা একটি পরীক্ষা-নল বের ক'রে তিনি আমাদের দেখিয়ে

বললেন,—এতেই আছে 'পাইরোফোরিক লেড'—একটু আগেই এ জিনিসটি আমি তৈরি করেছি। এর গুণ দেখলে অবাক হবেন বাবুমশাইরা।

জেড সাহেব এরপর টেবিলের ওপর একটা অ্যালুমিনিয়ামের



পাত রাখলেন। তারপর পরীক্ষা-নলের ছিপি খুলে ভেতরকার পাইরোফোরিক লেড চূর্ণ ঢাললেন তাতে। ঢালবামাত্রই মাঝপথে বাতাসের সংস্পর্শে এসে তাতে আগুন জ্বলে উঠলো। অ্যালুমিনিয়ামের পাতে পড়ার সুযোগ আর পেলো না।

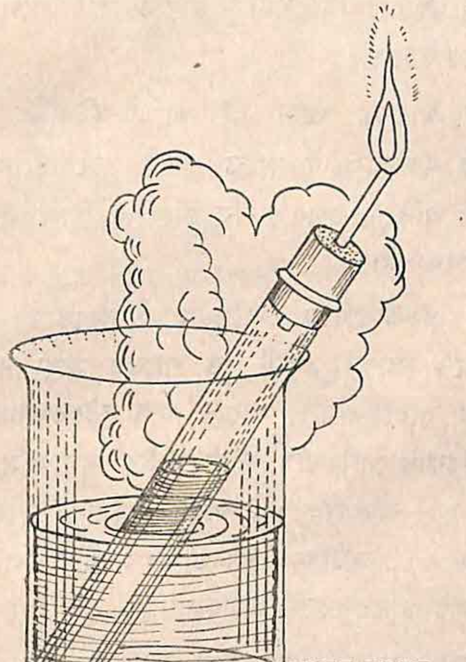
জেড সাহেব পাইরোফোরিক লেড তৈরির যে পদ্ধতিটা সেদিন আমাদের বলেছিলেন, সেটা এইরকম :

লেড অ্যাসিটেট দ্রবণে টারটারিক অ্যাসিড দ্রবণ মেশাতে হয়। মেশালে 'লেড টারট্রেট' লবণ অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই লবণটাকে ফিলটার কাগজের সাহায্যে ছেঁকে বায়ুতে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর সেই শুকনো লবণ পাইরেক্স কাচের তৈরি একটা পরীক্ষা-নলে রেখে অল্প গরম করতে হয়। তখন লেড টারট্রেট লবণটা বিয়োজিত হয়ে গিয়ে অতি সূক্ষ্ম লেড চূর্ণ উৎপন্ন করে। এইটাই 'পাইরোফোরিক লেড'।—জিনিসটা ঠাণ্ডা হ'লে পর পরীক্ষা-নলের মুখে ছিপি এঁটে দিতে হয়। সদ্য তৈরি পাইরোফোরিক লেড নিয়ে এ খেলাটি দেখাতে হয়, নইলে পরীক্ষা সফল হয় না।

● আপনারা-লণ্ঠন, কেরোসিন তেলের কুপী, মোমবাতি ও স্পিরিট ল্যাম্প প্রভৃতি অনেক বাতিই ব্যবহার করেছেন। সবাই জানেন—এই সব বাতির প্রত্যেকটিতেই পলতে থাকে। কিন্তু আমি আপনাদের এমন বাতি দেখাবো—যাতে পলতে নেই।—কথাগুলি বলে জাদুকর মিস্টার এক্স টেবিল থেকে কাচের একটি পরীক্ষা-নল তুলে নিলেন। সেটির মুখে একটি কর্ক লাগালেন। ঐ কর্কের ঠিক মাঝখানটিতে এফোঁড়-ওফোঁড় একটা ফুটো করলেন। সেই ফুটোর মধ্যে ছোট একটা কাচ-নল বসিয়ে দিলেন। কর্কের নীচে পরীক্ষা-নলের মধ্যে কাচ-নলটির খুব সামান্য অংশ বেরিয়ে রইলো। আর কর্কের দিকের অংশ কাচ-নলটির আড়াই সেন্টিমিটার মতো অংশ বেরিয়ে রইলো।

জাদুকর ছিপিটি খুলে পরীক্ষা-নলের মধ্যে খানিকটা মেথিলেটেড স্পিরিট ঢাললেন। তারপর কাচের নল সমেত কর্কটা নলের মুখে এঁটে দিলেন। এ অবস্থায় পরীক্ষা-নলটিকে ফুটন্ত জলভরা একটা বীকারে আংশিক ডুবিয়ে রাখলেন।

ফুটন্ত জলের তাপ পেয়ে স্পিরিট বাষ্পে পরিণত হলো। সেই বাষ্প কাচ-নলের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগলো। জাদুকর তখন কাচ-নলের উপর দিকের খোলা মুখে একটা জ্বলন্ত দিয়াশলাই কাঠি ধরলেন। অমনি স্পিরিট-বাষ্প কাচ-নলের মুখে



দিব্যি জ্বলতে লাগলো।—জাদুকর বললেন, এর নাম পলতেহীন বাতি'। পরীক্ষা-নলে যতক্ষণ স্পিরিট থাকবে, এই 'পলতেহীন বাতিও ততক্ষণ জ্বলবে।

● সহযোগী জাদুকর এরপর এগিয়ে এসে বললেন, এবার আপনারা দেখুন রসায়নের ত্রিশতম ভেলকি।—এই বলে স্বচ্ছ তরল-পূর্ণ একটি ফ্লাস্ক তিনি দর্শকদের একজনের হাতে দিলেন। দিয়ে

বললেন, আপনারা একে একে হাতে নিয়ে দেখুন—সত্যিই এতে তরল পদার্থ আছে কিনা। ফ্লাস্কটার মুখে ছিপি আঁটা ছিল।

জাদুকরের কথা শুনলেন দর্শকরা। একে একে তাঁরা ফ্লাস্কটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। কয়েক মিনিট কাটতেই ঘটলো এক অঘটন। ফ্লাস্কের গোটা তরলটা জমে কঠিন হয়ে গেলো। ফ্লাস্কটাও বেশ গরম হয়ে উঠলো।

সহযোগী জাদুকর তখন এই আশ্চর্য ঘটনাটির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, ঐ ফ্লাস্কে আমি রেখেছিলাম সোডিয়াম অ্যাসিটেটএর অতিপৃক্ত দ্রবণ।—কি ভাবে ঐ অতিপৃক্ত দ্রবণ তৈরি করেছিলাম তাও বলি।

পরিষ্কার একটি ফ্লাস্কে সোডিয়াম অ্যাসিটেটের কয়েকটি দানা ফেলে ফ্লাস্কটিকে জলপূর্ণ একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে পাত্রের জলকে গরম করেছিলাম। পাত্রের জল ফুটতে আরম্ভ করলে পর ফ্লাস্কের ভেতরকার সোডিয়াম অ্যাসিটেটের দানাগুলি সম্পূর্ণ গলে যায়। তৈরি হয়—স্বচ্ছ দ্রবণ। ঐ স্বচ্ছ দ্রবণই সোডিয়াম অ্যাসিটেটের অতিপৃক্ত দ্রবণ। ফ্লাস্কটিকে নাড়াচাড়া না ক'রে শীতল করবার জন্যে আমি টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছিলাম।

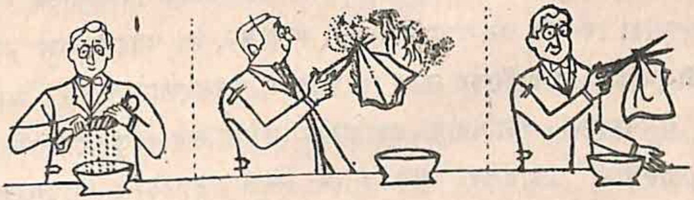
আপনাদের হাতে দেবার আগে সবার অলক্ষ্যে ওর মধ্যে আমি ফেলে দিয়েছিলাম সোডিয়াম অ্যাসিটেটের একটি দানা। ঐ দানা ফেলার পরেই ফ্লাস্কের গোটা তরলটা ধীরে ধীরে জমে কঠিন হয়ে যায়। অতিপৃক্ত দ্রবণের ঐটাই ধর্ম।—কিন্তু আপনারা ভাবলেন এ বুঝি কোন অলৌকিক কাণ্ড।

● জাদুকর এক্স এরপর দর্শকদের কাছে গিয়ে বলেন, আপনারা কেউ একটা সূতীর রুমাল দিতে পারেন আমাকে? আমার রুমালটা কোথায় যে ফেললাম—আর খুঁজে পাচ্ছি না।

দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন তাঁর রুমালটা এগিয়ে দেন জাদুকরের দিকে।—জাদুকর সেটা হাতে নিলেন। তারপর সামনে রাখা একটা তরলে ডুবিয়ে রুমালটিকে নিংড়ে নিয়ে যার রুমাল তাঁকে ডাকলেন। ডেকে তাঁর হাতে একটা দিয়াশলাই দিয়ে বললেন : এইবার এই রুমালটিতে আগুন ধরান দিয়াশলাই জ্বেলে।

ভদ্রলোক তো জাদুকরের কথা শুনে অবাক! অমন সুন্দর রুমালটা আগুনে পোড়াতে বলছেন জাদুকর! ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হলো নাকি?

—আরে ঘাবড়ান কেন মশাই? আপনাকে ঠিক্ এমনি একটি রুমাল আমি কিনে দেব খন। এখন যা বলি, তা করুন দিকি চট্‌পট্। —নিমরাজি হয়ে ভদ্রলোক অগত্যা দিয়াশলাই জ্বাললেন।—"রুমালের গায়ে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরুন"—বললেন জাদুকর।



রুমালের মালিক আর ইতস্ততঃ না ক'রে জ্বলন্ত কাঠিটা রুমালের উপর রাখলেন। অমনি দপ্ করে জ্বলে উঠলো রুমালটা। জাদুকর চিমটা দিয়ে ধরে জ্বলন্ত রুমালটিকে এদিকে ওদিকে দোলাতে লাগলেন। রুদ্ধশ্বাসে আমরা রুমালটার দহন দেখতে লাগলাম।

একটু বাদেই আগুনের শিখা গেল নিভে। জাদুকর সবাইকে অবাক করে দিয়ে রুমালটিকে নেড়ে দেখালেন যে সেটা অক্ষতই আছে—আগুনে পোড়ে নি।

রুমালের মালিক খুশী হলেন। কি ক'রে এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটালেন জাদুকর, তা জিজ্ঞাসা করায় মিস্টার এক্স বললেন : রুমালটা আমি একটি দ্রবণে ডুবিয়ে নিয়েছিলাম। দ্রবণটা কোহল ও জলের।

তারপর রুমালটিকে নিংড়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরানো মাত্রই কোহল জ্বলতে লাগলো—রুমালটি নয়। এমনই মৃদু সে জ্বলন, যে তার তাপে রুমালের সুতো পুড়লো না। অক্ষত রয়ে গেলো রুমালটা।

● রুমালটা তার মালিকের হাতে দিতে গেলেন জাদুকর। কিন্তু তা হাত ফস্কে মাটিতে পড়ে গেলো। মাটি থেকে সেটা কুড়োতে গিয়ে জাদুকরের হাতে লাগলো কাদা। তিনি বলে উঠলেন, হাতটা এবার ধুয়ে ফেলি,—কি বলেন ?

টেবিলের ওপর একটা বড় কাচ পাত্রে ছিল জল। জাদুকর সেই জলে হাত ধুলেন। তারপর ভিজে হাত একটা সাদা তোয়ালেতে মুছলেন।—অমনি জাদুকরের হাতখানি এবং সাদা তোয়ালেটি গাঢ় নীল রঙে রঞ্জিত হয়ে গেলো !

জাদুকর বললেন, রঙের এখেলা রাসায়নিক বিক্রিয়ারই ফল, আপনারা যে স্বচ্ছ তরলকে জল মনে করেছেন, তা আদৌ জল নয়। ওটা ফেরিক ক্লোরাইডের দ্রবণ। আর ঐ সাদা তোয়ালেটাকে আমি আগে থাকতে পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড দ্রবণে ডুবিয়ে শুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপর যখন আমি ভিজে হাতটা তোয়ালেতে মুছলাম, তখন আমার হাতের ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ আর তোয়ালের গায়ের পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটলো। তার ফলে উৎপন্ন হলো 'নীল রঙের 'ফেরিক ফেরোসায়ানাইড'। আর তাতেই আমার হাত ও সাদা তোয়ালেটা নীল রঙে রঞ্জিত হলো।

● স্পিরিট ল্যাম্প জ্বলছে টেবিলের উপর। পাশে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ (বিভিন্ন ধাতব লবণ) সাজানো আছে। আর ছোট ছোট কাচের প্লেটে রয়েছে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

জেড সাহেব কয়েকটি পরিষ্কার কাচদণ্ড হাতে নিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। জিনিসগুলি সব ঠিকঠাক আছে কিনা একবার

দেখে নিলেন। তারপর একটা কাচদণ্ডের আগা অ্যাসিডে ডুবিয়ে পরক্ষণেই একটা কাগজের প্যাকেটের ধাতব লবণে ডোবালেন। এরপর তা স্পিরিট ল্যাম্পের ওপরদিকের স্বচ্ছ শিখায় ধরে বললেন : আয় তো আমার সোনালী আলো।

—কী আশ্চর্য, অমনি শিখাটি সোনালী রঙের হয়ে গেলো।

অ্যাসিডে ভেজা কাচদণ্ডে এমনিভাবে জেড সাহেব এক একটা রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে আগুনের শিখায় ধরতে লাগলেন। কখনো বললেন : আয় তো আমার সবুজ আলো। কখনও বা বললেন : আয় তো আমার নীল আলো।

—আর অগ্নিশিখাও তাঁর আদেশ পালন করতে লাগলো। যে আলোকে ডাকে জাদুকর—সেই আলোকশিখাই দেখা যায়!

রাসায়নিক দ্রব্য যে এমন বশংবদ হয়, তা আগে আমি জানতাম না।

মিস্টার জেড বললেন : কাগজের এক একটা প্যাকেটে এক এক রকম ধাতব লবণ আছে। কোনটায় আছে ক্যালসিয়াম লবণ, কোনটায় কপার লবণ, কোনটায় লেড লবণ, কোনটায় বা স্ট্রনসিয়াম লবণ। গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ভেজা কাচদণ্ডে এদের একে একে নিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের স্বচ্ছ শিখায় ধরলে এক এক রকম রঙের শিখা সৃষ্টি হয়। ক্যালসিয়াম যৌগ থেকে হাল্‌কা সবুজ, কপার যৌগ থেকে নীলাভ সবুজ, লেড যৌগ থেকে নীলাভ সাদা, আর সোডিয়াম যৌগ থেকে সোনালী হলুদ রঙের শিখা সৃষ্টি হয়।

দর্শকদের মধ্যে একটি ছোট মেয়ে ছিল। জাদুকর তাকে শুধালেন : খুকি, মোমবাতির শিখায় তুমি আঙুল রাখতে পার?

খুকি বললে ; না।

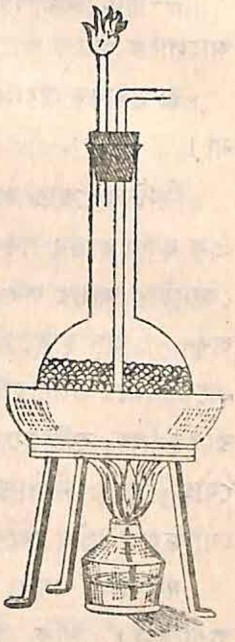
—কেন?

বাঃ রে, আঙুল যে তাহলে পুড়ে যাবে!

জাদুকর বললেন, জান খুকি, আমি এমন এক বাতি তোমাকে

দেখাব—যার শিখায় আঙুল পোড়ে না, দিয়াশলাইয়ের কাঠি—এমনকি কাগজও জ্বলে না। এখন দেখ—কি ভাবে আমি এই আজব 'শীতল শিখা' তৈরি করি।

—এই বলে জাদুকর ওয়াই একটা বড় কাচের ফ্লাস্কে কিছু সাদা ফসফরাস নিয়ে 'কাচের উল' দিয়ে তা ভালভাবে ঢেকে রাখলেন। ফ্লাস্কের মুখে আটকানো কর্কের ফুটো দুটির মধ্যে দিয়ে তিনি দুটি কাচ-নল প্রবেশ করালেন। একটি কাচ-নল সোজা। এটির এক প্রান্ত কর্কের মাথায় একটু উপরে এবং অপর প্রান্ত কর্কের তলার দিকে একটু নীচে বেরিয়ে রইলো।



অপর কাচ-নলটি সমকোণে বাঁকানো। এর বাঁকা অংশটি কর্কের মাথার উপরে রইলো। এই বাঁকা নল দিয়ে জাদুকর ফ্লাস্কের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ভরলেন। উদ্দেশ্য—ঐ গ্যাসের সাহায্যে ফ্লাস্কের মধ্যেকার সব বাতাসটুকু বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া।

এরপর জাদুকর ফ্লাস্কটিকে একটা 'জল-গাহে' (চওড়া মুখ যুক্ত ফুটন্ত জল পাত্রে) বসালেন। গরম জল থেকে তাপ পেতে লাগলো ফ্লাস্ক। একটু বাদেই ফ্লাস্কের মুখের খাড়া নলটির মুখে সবুজ আভাযুক্ত একটা শিখা জ্বলতে দেখা গেলো।—জাদুকর ওয়াই বললেন : ঐটাই শীতল শিখা।

: খুকু, তুমি এসে এই শীতল শিখায় হাত দাও। ভয় নেই—আঙুল তোমার পুড়বে না—আমি 'গ্যারান্টি' দিচ্ছি।

খুকু কিন্তু ভয়ে এক পাও নড়লো না।

● জাদুকর এবার আমাদের সামনে একখানি সাদা ড্রইং-কাগজ মেলে ধরলেন। তারপর তিনটি ছোট ছোট বীকারে তিন রকম রাসায়নিক দ্রব্যের দ্রবণ তৈরি করলেন। একটি হচ্ছে তুঁতের দ্রবণ। সেই দ্রবণে সরু তুলি ডুবিয়ে ড্রইং কাগজখানিতে তিনি গাছের গুঁড়ি ও ডালপালা আঁকলেন। তখন কাগজে কোন রঙিন দাগ আমরা দেখতে পেলাম না।

এরপর জাদুকর কোবাল্ট ক্লোরাইড ও নিকেল ক্লোরাইড-এর দ্রবণ তৈরি ক'রে তা দিয়ে আগে আঁকা গাছের পাতাগুলি আঁকলেন। তখনও কাগজে আমরা কোন রঙিন রেখা দেখতে পেলাম না।

জাদুকর বললেন : এ হলো 'অদৃশ্য ড্রইং,' তাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না। তবে এই অদৃশ্য ড্রইংকেই আমি মন্ত্রবলে দৃশ্য করে তুলতে পারব।

—এই বলে ড্রইংটার ওপর কয়েকবার জাদুদণ্ড স্পর্শ করিয়ে তিনি বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়তে লাগলেন। আর সেই সঙ্গে স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার ওপরে কাগজখানিকে মেলে ধরে আগুনের তাপ দিতে লাগলেন।

—আমরা রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছি, কি হয় না হয় দেখার জন্য।

দেখতে দেখতে হুবহু একটা পূর্ণাঙ্গ গাছের ছবি ফুটে উঠলো কাগজের ওপরে। গাছের কাণ্ড, ডালপালা ও পাতার রঙগুলিও জীবন্ত গাছের অনুরূপ হলো।

জাদুকর মিস্টার এক্স বেশ গর্বভরেই বলে উঠলেন: দেখলেন তো রসায়ন বিজ্ঞানের দৌলতে কতো অস্বাভাবিক ঘটনাও ঘটানো যায়!

● আরও দেখতে চান তো দেখাতে পারি। আপনাদের চমক লাগাবার জন্যে দেখাতে পারি 'চমক কাগজ'। —কথাগুলো বললেন জাদুকর মিস্টার এক্স।

এরপর জাদুকর 'চমক কাগজ' তৈরির কৌশল আমাদের দেখাতে

লাগলেন, প্রথমে একটি বীকারে তিনি চার আয়তন সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে পাঁচ আয়তন নাইট্রিক অ্যাসিড মেশালেন। মিশ্রণটিকে কাচদণ্ড দিয়ে বেশ ভালভাবে নাড়লেন। তারপর ব্লটিং কাগজ ছোট ছোট টুকরো করে কেটে মিনিট দশেক ঐ বীকারের অ্যাসিড-দ্রবণে ফেলে রাখলেন। কাগজগুলিকে তারপর কাচদণ্ডের সাহায্যে বীকার থেকে তুলে নিয়ে জলে ভাল করে ধুয়ে আগুনের তাপে শুকিয়ে নিলেন।

এরপর জাদুকর ঐ কাগজগুলির কতকগুলিকে কপার ক্লোরাইড দ্রবণে ভিজিয়ে নিলেন। কতকগুলিকে ভেজালেন পটাসিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে। বাকি কাগজগুলির কতক ভেজালেন স্ট্রনসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে ও বাকিটা ভেজালেন বেরিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে। তারপর এক একটি কাগজকে চিমটা দিয়ে তুলে মোমবাতির শিখায় একে একে ধরলেন।

আমরা 'রঙিন চমক' দেখতে লাগলাম অবাক হয়ে। দেখলাম —কপার ক্লোরাইডে সিক্ত কাগজ থেকে নীল, পটাসিয়াম নাইট্রেটে সিক্ত কাগজ থেকে বেগুনী, স্ট্রনসিয়াম ক্লোরাইডে সিক্ত কাগজ থেকে লাল, এবং বেরিয়াম ক্লোরাইডে সিক্ত কাগজ থেকে সবুজ আলোর চমক বেরুচ্ছে।

—রঙিন চমক দেখতে দেখতে আমাদের মনে পড়ে গেলো দেওয়ালীর রাতে বাজি পোড়ানোর কথা।

● রঙিন আলোর রেশ আমাদের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যেতে না যেতেই মিস্টার ওয়াই এক গাছি মোটা সুতো হাতে নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হলেন। বললেন, এটা হচ্ছে 'জাদু সুতো'।

দর্শকদের মধ্যে থেকে কে যেন শুধালো : সেটা আবার কেমন ধারা সুতো ?

—একটু ধৈর্য ধরুন, এখনই দেখাচ্ছি এই জাদু সুতোর কেরামতি। এই বলে সহযোগী জাদুকর ঐ সুতোটাকে খাদ্যলবণের গাঢ় দ্রবণে বার বার ডোবাতে লাগলেন। একবার ডোবান, তারপর আগুনের তাপে শুকিয়ে নেন। আবার ঐ দ্রবণে ডোবান, আবার শুকিয়ে নেন।—বেশ কয়েকবার এই প্রক্রিয়ায় সুতোটিকে লবণজল-সিক্ত করে ও শুকিয়ে নিয়ে তিনি বলে ওঠেন: এইবার আমার জাদু-সুতো 'জাদু' দেখবার জন্যে প্রস্তুত। আপনারা দেখুন।

—এই বলে মিস্টার ওয়াই ঐ সুতোর এক প্রান্তে একটা ধাতব রিং (যে রিং পর্দা টাঙাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়) বেঁধে দিলেন। রিং সমেত সুতোটাকে তিনি একটা হুক থেকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর দিয়াশলাই জ্বেলে সুতোয় অগ্নিসংযোগ করলেন।

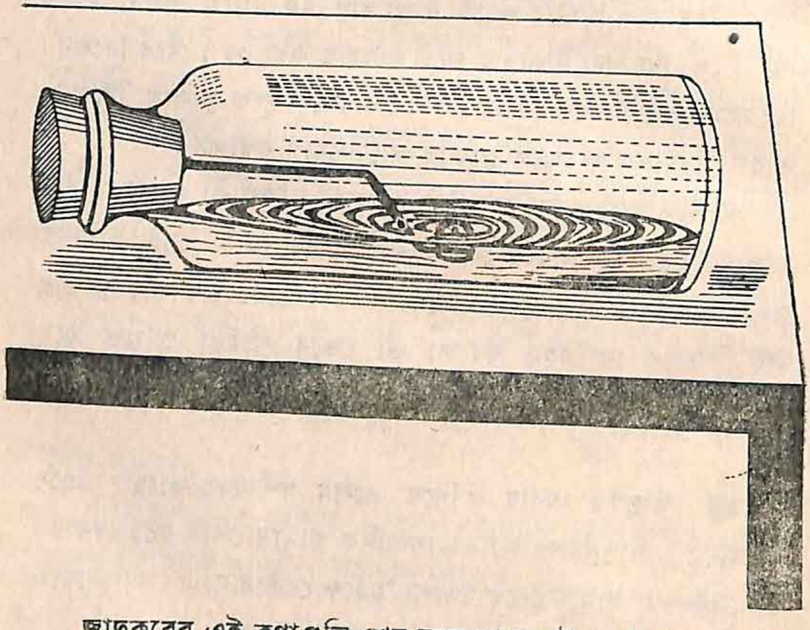
আগুনে জ্বলে সুতো ছাই হয়ে গেলো। কিন্তু কী আশ্চর্য, ছাইটা হলো ঐ সুতোরই আকৃতি বিশিষ্ট এবং ধাতব রিংটা সেই ছাইয়ের তলায় আগের মতোই ঝুলতে লাগলো। ভারী রিংটার ভার সুতোর ছাই কিভাবে যে বহন করলো তা ভেবে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।—সত্যিই, জাদু সুতোর কেরামতি দেখবার মতো বটে।

● জাদুকর এবার এগিয়ে এলেন দর্শকদের কাছে। এসে বললেন: আপনাদের আমি রাসায়নিক কামান তৈরি করে দেখাব। ভয় নেই—এ কামান থেকে গোলা ছিটকে বেরুবে না। আপনারাও কেউ আহত হবেন না। তবে অবাক হবেন বৈকি।

—এই বলে মিস্টার এক্স এক টুকরো কাগজের মধ্যে টারটারিক অ্যাসিডের কয়েকটি দানা রেখে কাগজটিকে ভাল করে মুড়ে ফেললেন। কাগজের ঐ মোড়কটিকে একটা লম্বা ও সরু তারের একপ্রান্তে বেশ শক্ত করে বাঁধলেন। কর্কের যে দিকটা বোতলের মধ্যে থাকে, সেই দিকে ঐ তারের অপর প্রান্ত আলগাভাবে আটকে দিলেন। তারপর কর্কটিতে একটা বড় বোতলের মুখে এঁটে বোতলটিকে টেবিলের ওপর

কাত করে শুইয়ে রাখলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বোতলের তলার দিকে একটা তরল পদার্থ রয়েছে এবং কাগজের মোড়কটি ঐ তরলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। বোতলের মধ্যে তরলের উপরকার অংশ ফাঁকা।

মিস্টার এক্স বলতে লাগলেন : বোতলের মধ্যে যে তরল পদার্থ দেখছেন আপনারা—সেটা জল নয়—সোডা ও পটাশের জলীয় দ্রবণ মাত্র।



জাদুকরের এই কথাগুলি শেষ হতে না হতেই 'দুম্' ক'রে একটা শব্দ হলো। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে বোতলের মুখে আঁটা কর্কটা ঐ শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দূরে ছিটকে বেরিয়ে গেলো। পড়লো দর্শকদের মাঝে এক জায়গায়।

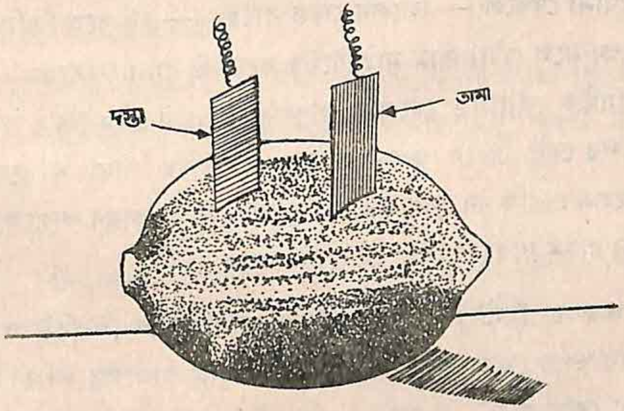
মিস্টার এক্স বললেন : সোডা ও পটাশের জলীয় দ্রবণে টারটারিক অ্যাসিড মিশলে উৎপন্ন হয় কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস। বোতলের মধ্যে ঐ গ্যাসের চাপ যখন খুব বেশী হয়, তখনই সশব্দে কর্কটা

বোতলের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। খেলাঘরের রাসায়নিক কামানের রহস্যটা এই।

পাতিলেবু থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় নাকি ?

—মিস্টার জেড বললেন, তাও নাকি সম্ভব। একথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। হাতে-কলমে পরীক্ষাটা করে দেখাতেও উদ্যোগী হলেন।

একটা পাতিলেবু আগেই তিনি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। এবার সেটাকে টেবিলের ওপর রেখে গড়িয়ে গড়িয়ে তার ওপর হাতের চাপ দিতে লাগলেন। বললেন, এতে করে লেবুর ভেতরকার কিছু কোয়া ফেটে গিয়ে রস ক্ষরিত হবে।



লেবুটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে চাপ দেওয়ার পালা শেষ হ'লে পর মিস্টার জেড ধারালো আগাযুক্ত একটা পাতলা ও সরু তামার পাত এবং দস্তার পাতিলেবুটার গায়ের ওপর পাশাপাশি রেখে গেঁথে দিলেন। পাত দু'টি পরস্পরকে স্পর্শ করলো না কিন্তু।

এরপর সরু অন্তরিত তামার তারের সাহায্যে একটা গ্যাল-ভ্যানোমিটার যন্ত্রের দুই প্রান্তের সঙ্গে ঐ ধাতব পাত দু'টি যুক্ত ক'রে

দিলেন মিস্টার জেড। তামার সঙ্গে গ্যালভ্যানোমিটারের পজিটিভ প্রান্ত এবং দস্তার পাতের সঙ্গে গ্যালভ্যানোমিটারের নেগেটিভ প্রান্ত যুক্ত করলেন।—ব্যস্, অমনি গ্যালভ্যানোমিটার যন্ত্রের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটলো।

জেড সাহেব বললেন, গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ তড়িৎ প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

—এ বিদ্যুৎ এলো কোথা থেকে ?

—এসেছে ঐ পাতিলেবু থেকেই !

—ভাবতেও অবাক লাগে !

● আরও অবাক হবেন আপনারা 'অদৃশ্য কালির' কাণ্ড কারখানা দেখলে।—বললেন জেড সাহেব।—এই বলে তিনি একটা পরীক্ষা-নলে পটাসিয়াম নাইট্রেটের কয়েকটি দানা ফেললেন। তাতে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ঢেলে কাচদণ্ড দিয়ে নেড়ে দ্রবণ তৈরি করলেন। তারপর সেই দ্রবণে কলম ডুবিয়ে তা দিয়ে সাদা কাগজে কিছু লিখলেন।—কি যে লিখলেন, তা বুঝলাম না। কারণ কাগজের গায়ে কোন রঙিন দাগই আমরা দেখতে পেলাম না।

এরপর মিস্টার জেড যেই না কাগজটাকে স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার ওপর মেলে ধরে তাপ দিলেন, অমনি কাগজের ওপর গোলাপী রঙের লেখা ফুটে উঠলো। গোলাপী রঙের সেই লেখাটি হলো 'মিস্টার জেড'।

এরপর মিস্টার জেড বললেন,—নানান্ রঙের অদৃশ্য কালি তৈরি করা যায়। পদ্ধতি প্রায় একই রকম। তফাত শুধু রাসায়নিক দ্রব্য নির্বাচনে। যেমন, নীল রঙের অদৃশ্য কালির জন্যে দরকার হয় কোবাল্ট ক্লোরাইড। আবার বাদামী রঙের অদৃশ্য কালি তৈরি করতে হ'লে দরকার হয় সিলভার নাইট্রেট লবণ।

● জাদুকর মিস্টার এক্স এবার টেবিলের ওপর একটি ত্রিপদ স্ট্যাণ্ড রাখলেন। তার ওপর বসালেন একটি কাচের বীকার। বীকারের মধ্যে 'প্যারানাইট্রোটলুইন' নামে একটা রাসায়নিক দ্রব্য রাখলেন। তারপর খুব সাবধানে তাতে একটুখানি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে লেই তৈরি করলেন। লেই তৈরি হ'লে পর স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে জাদুকর বীকারের অর্ধতরল মিশ্র পদার্থটিকে গরম করতে লাগলেন।

—হঠাৎ বীকার থেকে প্লাস্টিক জাতীয় একটা পদার্থ দুধের ফেনার মতো ফুলে-ফেঁপে উঠে বীকার উপ্‌চিয়ে পড়তে লাগলো। জাদুকর তখন এমন ভাবটা দেখালেন,—যেন ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত এবং তা দেখে তিনি খুবই ভয় পেয়ে গেছেন!

রাসায়নিক দ্রব্যে তাপ দিলে যে কতো বিচিত্র ব্যাপার ঘটে তা দেখে আমরা অবাক হলাম।

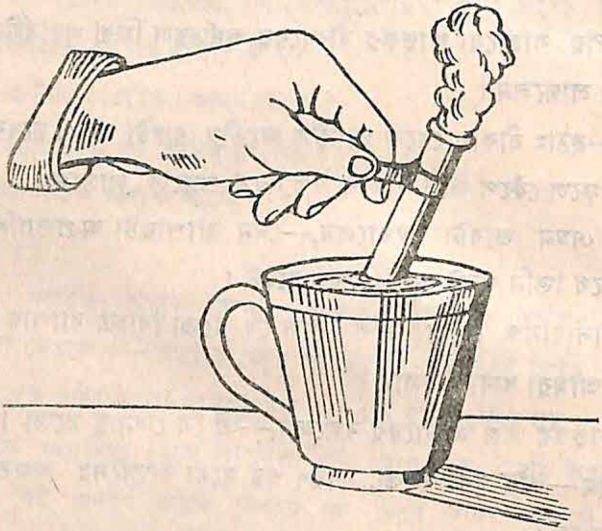
জাদুকর এক্স আমাদের বললেন,—ঐ যে ফেনার মতো জিনিসটা দেখছেন—ওটা খুবই হাল্কা, কারণ ওর মধ্যে বাতাসের অজস্র বুদ্‌বুদ্‌ ভরা আছে।

● বিনা আগুনের তাপে জলকে ফোটানো যায় কি?—প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করলেন সহযোগী জাদুকর।—আমরা সমস্বরে বললাম: না—না।

—নিশ্চয়ই যায়। বিশ্বাস না হয় তো দেখুন আপনারা। এই বলে মিস্টার ওয়াই টেবিল থেকে একটা খালি চায়ের কাপ নিয়ে তাতে কিছুটা ঠাণ্ডা জল রাখলেন। তারপর ঐ কাপের জলে অল্প অল্প ক'রে সম আয়তনের গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাললেন। ঢালবার সময় একটা কাচদণ্ডের সাহায্যে দ্রবণটিকে ঘন ঘন নাড়তে লাগলেন।

এরপর মিস্টার ওয়াই একটি পরীক্ষা-নলে কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ

জল নিয়ে নলটি কাপের ঐ অ্যাসিড দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলেন। তারপর জাদুদণ্ডটাকে বার বার ঐ পরীক্ষা-নলের ওপরে ঘোরাতে লাগলেন আর বিড়বিড় করে অস্ফুট স্বরে কি সব মন্ত্র পড়তে লাগলেন। মন্ত্রের ভাষা বা অর্থ আমরা কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু একটু বাদেই আমরা



লক্ষ্য করলাম যে—জাদুকরের কথাই ঠিক। পরীক্ষা-নলের জল সত্যিই ফুটতে আরম্ভ করেছে। ভক্‌ভক্ ক'রে সাদা রঙের স্টিম বেরুচ্ছে পরীক্ষা-নলের মুখ দিয়ে। তার মানে, নলের মধ্যেকার জলের উষ্ণতা নিশ্চয়ই একশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌঁচেছে।

—এই তাজ্জব ব্যাপার দেখে আমরা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। মিস্টার ওয়াই বললেন যে, জলে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ফেললে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। আর এক্ষেত্রে সেই তাপেই জলটা ফুটছে।

● জাদুকর মিস্টার এক্স একটি ছেলেকে শুধালেন: রুপোর গাছ দেখেছ খোকা?—ছেলেটি তো অবাক। সে বলে: রুপোর গাছ আবার হয় না কি?

—হয় বৈকি! দেখবে তুমি?

ঘার নেড়ে সম্মতি জানায় ছেলেটি।

মিস্টার এক্স তখন বেশ বড়সড় ও মজবুত গড়নের কাচের একটি পরীক্ষা-নল টেবিল থেকে তুলে নিলেন। তার মধ্যে আধ গ্রাম আন্দাজ 'সিলভার নাইট্রেট' যৌগের দানা ফেলে দিলেন। তাতে আধ আউন্স আন্দাজ জল ঢেলে ঝাঁকাতে লাগলেন।

আমরা দেখলাম যে সিলভার নাইট্রেটের দানাগুলি পাতিত জলে সম্পূর্ণ গুলে গেছে।



জাদুকর এবার ছোট একটি কাচদণ্ডের মাঝখানে পরিষ্কার একখণ্ড তামার তারের একপ্রান্ত বাঁধলেন। তারপর কাচদণ্ডটিকে পরীক্ষা-নলের খোলা মুখের ওপর এমনভাবে রাখলেন, যাতে ক'রে তামার তারের বেশীর ভাগ অংশ দ্রবণের মধ্যে ডুবে থাকে। এরপর খুব সন্তর্পণে তিনি পরীক্ষা-নলটিকে একটি 'টেস্টটিউব স্ট্যাণ্ডে' খাড়াভাবে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, এতক্ষণ তো বীজ পুঁতলাম মাত্র। বীজ পোঁতা মাত্রই তো চারাগাছ বেরোয় না। সময় লাগে। কাজেই রুপোর গাছ দেখতে হ'লে সময় চাই। কমসে কম দু'ঘণ্টা তো বটেই। ইতিমধ্যে আপনারা পরবর্তী ভেল্‌কিবাজীগুলো দেখে নিন্।

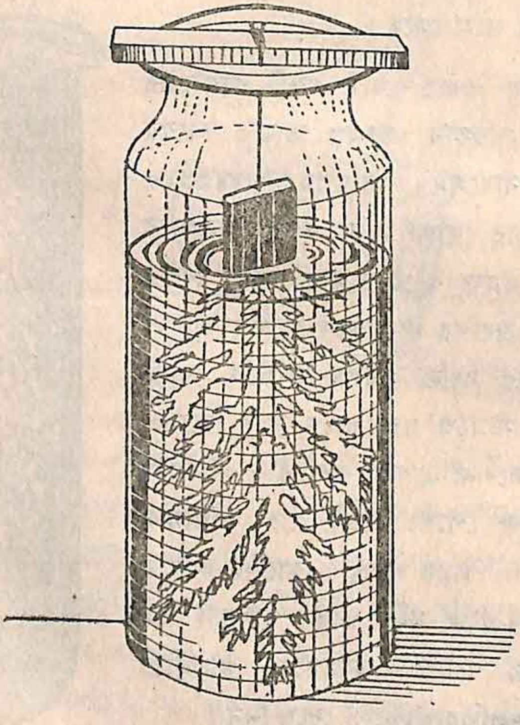
সেই ছোট্ট ছেলেটির কিন্তু কৌতূহলের অন্ত নেই। জাদুকরকে সে জিজ্ঞাসা করে: রুপোর গাছ কেমন করে হবে দাদা?

জাদুকর বলেন: সে এক ভারী মজার ব্যাপার। সিলভার নাইট্রেট যৌগ থেকে রুপোর ছোট ছোট কণা বেরিয়ে তামার তারের

গায়ে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে সুন্দর গাছের আকৃতি লাভ করবে। চক্চকে ঐ জিনিসটাই হবে 'রুপোর গাছ'।

● বুঝলে খোকা, শুধু রুপোর গাছই নয়,—সীসার গাছও আমরা তৈরি করতে পারি। উপকরণটা অবশ্য ভিন্ন।

—এই বলে জাদুকর পেট মোটা একটা কাচের বোতল টেনে নিলেন টেবিল থেকে। দেখলাম—বোতলটি আগে থেকেই ধুয়ে-



মুছে পরিষ্কার ক'রে রাখা হয়েছে। বোতলের মধ্যে জাদুকর ছয়-সাত গ্রাম আন্দাজ 'লেড-অ্যাসিটেট' যৌগের দানা ফেললেন। তারপর তাতে আধ বোতল জল ঢেলে যৌগটাকে জলে গুলে নিলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, দ্রবণটি স্বচ্ছ হয় নি—ঘোলাটে ভাব রয়েছে তাতে।

মিস্টার এক্স বললেন, ঘোলা দ্রবণে কাজ হবে না। ওটাকে স্বচ্ছ করবার জন্যে তিনি ঐ দ্রবণে সামান্য পরিমাণ লঘু অ্যাসিটিক অ্যাসিড ঢাললেন। অমনি দ্রবণটি স্বচ্ছ হয়ে গেলো।

এর পর জাদুকর একটা পরিষ্কার জিংকদণ্ড নিয়ে মোটা সুতোর সাহায্যে বেঁধে বোতলের খোলা মুখের ওপরে রাখা একটি কাচদণ্ড থেকে দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। জিংকদণ্ডের তিন-চতুর্থাংশ বোতলের দ্রবণে ডুবে রইলো।

জাদুকর বললেন, এই অবস্থায় বোতলটিকে নাড়াচাড়া না করে বেশ কয়েক ঘণ্টা (ছয়-সাত ঘণ্টা) রেখে দিলেই দেখা যাবে যে, জিংক দণ্ডটার যে অংশ দ্রবণে ডুবে আছে, সেই অংশ থেকে ফার্নের মতো ডালপালাযুক্ত সুন্দর সীসার গাছ গজিয়েছে। আমাদের এই 'শো' তো অতক্ষণ চলবে না। তাই গতকালের তৈরি একটি সীসার গাছ আপনাদের দেখাচ্ছি।—এই বলে র‍্যাক থেকে অতি সন্তর্পণে অমনি একটি বোতল বের করে তিনি টেবিলের ওপর রাখলেন।

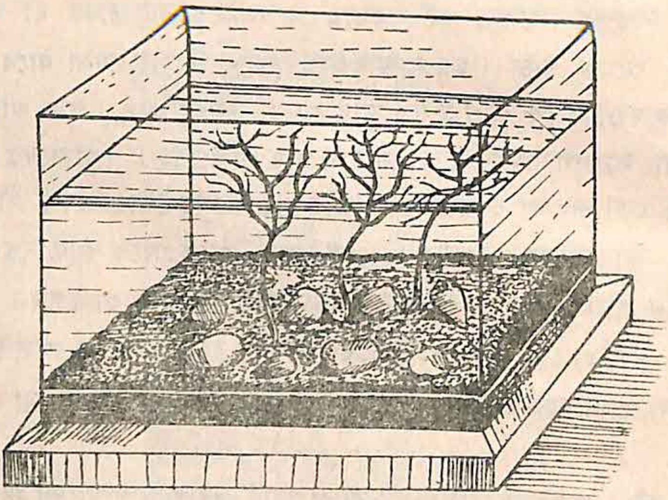
—সত্যি তো, জিনিসটা গাছের মতোই বটে। দিব্যি ডালপালা মেলে খাড়া হয়ে রয়েছে।—আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইলো না।

● সহযোগী জাদুকর মিস্টার ওয়াই এর পর আমাদের সামনে হাজির করলেন যে জিনিসটি, তার নাম 'রাসায়নিক বাগান'। বললেন —এটিও গতকালের 'শো'-এর সময় তৈরি। দেখতে অনেকটা ছোটখাটো অ্যাকোয়ারিয়ামের মতো। তবে অ্যাকোয়ারিয়ামে থাকে মাছ, আর এতে আছে রঙিন সব গাছপালা। সত্যিকারের গাছপালা অবশ্য নয়। হরেক রকম রাসায়নিক দ্রব্যের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন—গাছের মতো দেখতে রঙিন পদার্থ।

দেখলাম—চার-কোণা কাচপাত্রটির তলায় এক সেন্টিমিটার পুরু ক'রে বালি বিছানো আছে। তার ওপর ইতস্তত ছড়ানো আছে ছোট-বড় নানান আকারের নুড়ি পাথর।

—'কিভাবে এমন সুন্দর রাসায়নিক বাগানটা বানালাম, তা বলি এবার।'

মিস্টার ওয়াই বলতে লাগলেন, সোডিয়াম সিলিকেট নামে একটা রাসায়নিক দ্রব্য আছে। এই রাসায়নিক দ্রব্যটিকে 'ওয়াটার গ্লাস'ও বলা হয়। দু'চামচ ওয়াটার গ্লাসের গুঁড়ো এক কাপ গরম জলে ফেলে চামচ দিয়ে নাড়লে ওয়াটার গ্লাসের স্বচ্ছ দ্রবণ তৈরি হয়। কাচপাত্রের তিন-চতুর্থাংশ ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হয়।



কেমিস্টের দোকান থেকে কিনে আনা কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য আগের থেকেই হাতের কাছে রাখতে হয়। সেই রাসায়নিক দ্রব্যগুলি হলো ফেরিক ক্লোরাইড (হরিদ্রাভ-বাদামী রঙের স্ফটিক), কোবাল্ট নাইট্রেট (হালকা লাল রঙের স্ফটিক), ফেরাস সালফেট (হালকা সবুজ রঙের স্ফটিক), কপার সালফেট (নীল রঙের স্ফটিক) এবং জিংক সালফেট (সাদা রঙের স্ফটিক)।

সব রঙের স্ফটিক একটি বা দু'টি ক'রে কাচপাত্রের ওয়াটার গ্লাস দ্রবণে ফেলে দিয়ে সাত-আট ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। ঐ সময়ের মধ্যে কাচপাত্রটিকে নাড়াচাড়া করতে নেই। তাহ'লেই তৈরি হয়

এমন সুন্দর 'রাসায়নিক বাগান'।—এই বলে সহযোগী জাদুকর তাঁর জাদুদণ্ডটিকে রাসায়নিক বাগানের দিকে নির্দেশ করলেন।

তারপর বললেন,—এক রঙের রাসায়নিক দ্রব্যের একাধিক কণা একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত হয়ে এক একটি গাছের আকার লাভ করে। কপার সালফেটের স্ফটিক নীল রঙের। ওয়াটার গ্লাস দ্রবণে ঐ স্ফটিক ফেললে স্ফটিকটি দ্রবণের জলে মিশতে আরম্ভ করে।—যতই মেশে, ততই 'কপার সিলিকেট' ও 'সোডিয়াম সালফেট' নামক যৌগ দু'টি উৎপন্ন হতে থাকে। কপার সিলিকেট নীল রঙের যৌগ এবং এটা জলে মেশে না। এর এক একটা কণা উৎপন্ন হওয়া মাত্রই কপার সালফেটের স্ফটিকের ওপর জমতে থাকে। জমে জমে শেষে ডালপালাযুক্ত একটা নীল রঙের গাছের আকার ধারণ করে। অন্যান্য যৌগের স্ফটিক থেকেও এমনিভাবে এক একটি রঙিন রাসায়নিক গাছ সৃষ্টি হয় এবং ঐ রাসায়নিক গাছগুলিই গড়ে তোলে 'রাসায়নিক বাগান'।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা জাদুকরের কথাগুলো শুনলাম। মনে মনে ভাবলাম—এমন বাগান যদি তৈরি ক'রে ঘরে রাখি তো ঘরের শোভা অনেক বেড়ে যাবে।

● জাদুকরের টেবিলে একটি খালি ও পরিষ্কার দোয়াত পড়েছিল। মিস্টার এক্স সেটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এ দিয়ে আমি তৈরি করব এক অভিনব যন্ত্র—যার সাহায্যে আগুন নেভানো যায়। এক কথায় এটি দিয়ে আমি বানাব 'আগুন নেভাবার যন্ত্র'। বুঝলেন ?

—এই বলে উনি ঐ দোয়াতের অর্ধেকটা 'সোডিয়াম বাই কার্বনেট' নামক ক্ষারের জলীয় দ্রবণ দিয়ে ভর্তি করলেন। তারপর কাচের ছোট্ট একটা পরীক্ষা-নল নিয়ে তার অর্ধেকটা সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে পূর্ণ করলেন। অ্যাসিড সমেত ঐ পরীক্ষা-নলটি

দোয়াতের ভেতরকার দ্রবণে ধীরে ধীরে খাড়াভাবে ভাসিয়ে দিলেন। এর পর ঐ দোয়াতের মুখে জাদুকর একটি কর্ক আটকালেন। আগে থেকেই কর্কের মাঝখানে একটা ছিদ্র করা ছিল। ঐ ছিদ্রের ভেতর দিয়ে সমকোণে বাঁকানো একটি কাচ-নল লাগালেন। কাচ নলের একপ্রান্ত কর্কের নীচের দিকে একটুখানি বেরিয়ে রইলো।

জাদুকর এর পর একটি মোমবাতি জ্বেলে টেবিলের ওপর খাড়াভাবে বসালেন। তারপর দোয়াতটিকে বেশ ভাল ক'রে ঝাঁকালেন। ঝাঁকুনির চোটে পরীক্ষা-নলের অ্যাসিড মিশে গেলো দোয়াতের ক্ষার দ্রবণের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অলক্ষ্যে অ্যাসিড ও ক্ষারের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে উৎপন্ন হ'তে লাগলো অদৃশ্য 'কার্বন ডাইঅক্সাইড' গ্যাস।

মোমবাতির শিখার উপর দোয়াতের মুখে লাগানো কাচ-নলের প্রান্তটা জাদুকর ধরলেন। মোমবাতির শিখার গায়ে অবিরাম কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বর্ষিত হ'তে থাকায় শিখা বাতাসের সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়লো। ফলে—মোমবাতির শিখা গেল নিভে।

জাদুকর তাঁর জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে বললেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস যে দহনে সহায়তা করে না—এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

● অনেকক্ষণ বাদে আবার জেড সাহেবকে দেখা গেলো তাঁবুর ভেতরে। এবার তাঁর হাতে একটা খালি ডিমের খোলা। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম,—দেখা যাক্, উনি এবার কি খেলা দেখান।

মিস্টার জেড বিশেষ ভণিতা না করেই দর্শকদের শুধালেন: বলুন দেখি, খালি ডিমের খোলা জলে ভাসে না ডোবে?—এবারও সেই মাস্টার সুলভ প্রশ্ন।

দর্শকদের মধ্যে কেউ বললেন ভাসে, কেউ বললেন ডোবে। কেউ কেউ বা আবার এই সব উত্তর শুনে হাসতে থাকেন। জেড

সাহেব বলেন, হাসবেন না বাবুমশাইরা। এঁরা তো ঠিক কথাই বলেছেন। খালি ডিমের খোলা জলে ডোবে, আবার ভাসেও। বিশ্বাস না হয় তো দেখুন।

—এই বলে তিনি ডিমের খোলাটা টেবিলের ওপরে রাখা একটি পাত্রের বর্ণহীন স্বচ্ছ তরলে ফেলে দিলেন। ডিমের খোলাটি প্রথমে ঐ তরলে ডুবে গেলো কিন্তু একটু পরেই উপরে উঠে এসে ধীরে ধীরে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

মিস্টার জেড শুধালেন, কেন ডিমের খোলাটি উপরে উঠে এলো জানেন ?—শুনুন তবে বলি।

আপনারা বর্ণহীন যে স্বচ্ছ তরলকে জল মনে করেছিলেন, সেটা জল নয়—লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ডিমের খোলাটা তৈরি খড়িমাটি (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) দিয়ে। খড়িমাটি আর লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। এই গ্যাসের উৎপত্তির ফলেই ডিমের খালি খোলাটা তরলের উপরে ভেসে ওঠে ও ঘুরপাক খায়।

● মিস্টার জেড এর পর গল্প শুরু করলেন: সেবার আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম টাটানগরে। আপনারা হয়তো জানেন যে টাটানগরে সুন্দর একটি পার্ক আছে। সেই পার্কের নাম 'জুবিলি পার্ক'। পার্কে অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। সন্ধ্যার পর ফোয়ারা খুলে দেওয়া হয়। ফিন্‌কি দিয়ে সেগুলি থেকে জল ছিটকে বেরুতে থাকে। তার ওপর ফেলা হয় নানা রঙের আলো। ভারী সুন্দর লাগে সেই রঙিন ফোয়ারা দেখতে।

পার্কের মতো অত বড় ফোয়ারা না হ'লেও ছোটখাটো ফোয়ারা আমি তৈরি ক'রে দেখাতে পারি আপনাদের। প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্তর সামনেই আছে। আপনারা শুধু দেখুন—কি করি আমি।

টেবিলের উপর 'হাইড্রোজেন ক্লোরাইড' গ্যাস ভরা একটি কাচের ফ্লাস্ক পড়ে ছিল। ফ্লাস্কের মুখে আঁটা ছিল কর্ক। জেড সাহেব স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আটকানো একটা লোহার রিং-এর ওপরে সেটাকে উপুড় ক'রে বসালেন। তারপর কর্কের মুখে ফুটো ক'রে ছুঁচলো আগাবিশিষ্ট একটি লম্বা কাচ-নল ফ্লাস্কের মধ্যে ঢোকালেন। কাচ-নলের ছুঁচলো প্রান্তটি রইলো ফ্লাস্কের মধ্যে। আর মোটা প্রান্তটি রইলো ফ্লাস্কের নীচে রাখা জলভরা একটি কাচপাত্রের মধ্যে। ঐ পাত্রের জলে মিস্টার জেড একটুখানি নীল লিটমাস দ্রবণ ঢেলে দিলেন। অমনি জলের রঙ নীল হয়ে গেলো। জাদুকর এর পর বরফ জলে ভেজানো ন্যাকড়ার সাহায্যে ফ্লাস্কটিকে ঠাণ্ডা করতে লাগলেন।

ঠাণ্ডা করার ফলে ফ্লাস্কের মধ্যেকার গ্যাস আয়তনে সামান্য সংকুচিত হয়। তার ফলে নীচের পাত্র থেকে কয়েক ফোঁটা নীল জল গ্যাসভরা ফ্লাস্কে ঢুকে পড়ে। ঐ জলটুকুতে ফ্লাস্কের খানিকটা গ্যাস দ্রবীভূত হয়। তখন ফ্লাস্কের মধ্যে গ্যাসের চাপ আরও কমে যায়। বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপে পাত্রের নীল জল তখন ঐ কাচ-নল বেয়ে নলের ছুঁচলো প্রান্ত দিয়ে ফ্লাস্কের মধ্যে ফোয়ারার আকারে ঝরে পড়তে থাকে।

—আমরা লক্ষ্য ক'রে দেখলাম যে, পাত্রের নীল জল ফোয়ারার আকারে ফ্লাস্কের মধ্যে ঢুকেই লাল হয়ে যাচ্ছে।

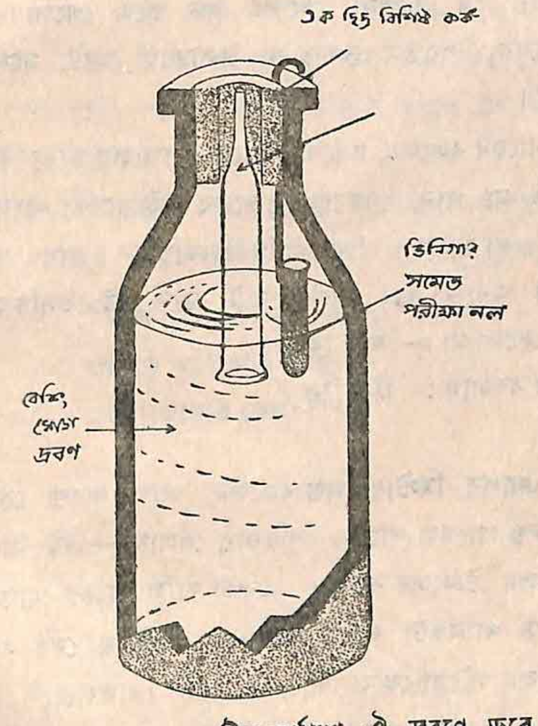
জেড সাহেব বললেন: তা তো হবেই। ফ্লাস্কের গ্যাসটা যে অ্যাসিডধর্মী গ্যাসের সংস্পর্শে নীল লিটমাস দ্রবণ এলেই লাল হয়ে যায় যে!

—সত্যি কথা বলতে কি, রসায়নের এই ভেল্‌কিটা সেদিন বড় আনন্দ দিয়েছিল আমাকে।

● মিস্টার জেড বলতে লাগলেন: আর এক রকম ফোয়ারা

দেখাব আপনাদের। এ ফোয়ারা বানাতে এবং চালু করতে ঝামেলা আগেরটার চেয়ে অনেক কম।—এই বলে উনি টেবিল থেকে একটি খালি বোতল তুলে নিলেন। বোতলের মুখে একটিমাত্র ছিদ্রযুক্ত কর্ক লাগালেন। তারপর কালি তোলার বা ফেলার একটি 'ড্রপার'-এর মাথার রবারের টুপিটা খুলে ফেলে সেই কাচ-নলটিকে বোতলের মুখে আঁটা কর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। এমনভাবে ঢোকালেন যে, নলের সরু ছিদ্রযুক্ত মুখটা কর্কের উপরকার খোলা মুখের একটুখানি নীচে থাকে।

জেড সাহেব এরপর বেকিং সোডার জলীয় দ্রবণ তৈরি ক'রে ঐ বোতলের মধ্যে ঢাললেন। বোতলের তিন-চতুর্থাংশ ঐ দ্রবণে পূর্ণ



হলো। 'ড্রপার'এর কাচ-নলটির অর্ধাংশ ঐ দ্রবণে ডুবে রইলো। এরপর জাদুকর জেড খুব ছোট্ট একটি পরীক্ষা-নলে ভিনিগার

ভরলেন। পরীক্ষা-নলটি তার দিয়ে বেঁধে বোতলের মুখ থেকে কৌশলে ঝুলিয়ে দিলেন। ভিনিগার সমেত পরীক্ষা-নল বোতলের দ্রবণে আধ ডোবা অবস্থায় খাড়া হয়ে রইলো।

এরপর জাদুকর বোতলের ওপরে তাঁর জাদুদণ্ড বার কয়েক স্পর্শ করিয়ে হাত দিয়ে বোতলটিকে একটু ঝাঁকুনি দিলেন।—ব্যস, ওতেই কাজ হলো।—পরীক্ষা-নলের ভেতরকার ভিনিগার (অ্যাসিড) পড়লো বেকিং সোডার (ক্ষার) জলীয় দ্রবণে। সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে উৎপন্ন হতে লাগলো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। সেই গ্যাসের চাপে বেকিং সোডা দ্রবণ 'ড্রপার'এর কাচ-নল বেয়ে উঠে ফোয়ারার আকারে বোতলের বাইরে ঝরে পড়তে লাগলো। ফোয়ারা কিছুক্ষণ চালু থাকার পর আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেলো। কারণ তখন দ্রবণের উপরতল ড্রপারএর তলাকার মোটা মুখের নীচে নেমে গেছে।

জেড সাহেব বললেন, দর্শকেরা যাতে বোতলের মধ্যে কি আছে, তা দেখতে না পান, সেজন্যে বোতলের বাইরের গা কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে রাখা উচিত। কিন্তু আমি তা করিনি। কারণ, তা করলে আপনাদের অবাক করা যেতো বটে, তবে এই ভেল্কির রহস্যটা বোঝানো যেতো না।—তাই কিনা ?

আমরা বললাম : ঠিক্-ঠিক্।

● এরপর মিস্টার জেড বললেন, আজ অবশ্য হোলি নয়, তবুও হোলির আমেজ পাবেন এবারকার খেলায়।—এই বলে তিনি এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। একটা খালি কাচের বোতল টেনে নিয়ে তাতে খানিকটা জল ঢাললেন। তারপর সেই জলে অল্প ফেনপ্থ্যালিন গুঁড়ো ফেলে দিয়ে ছিপি এঁটে বোতলটাকে ঝাঁকাতে লাগলেন।—বোতলের জলটা ঘোলাটে হয়ে গেলো।

এবার মিস্টার জেড ঐ ঘোলাটে জলে কিছুটা 'লাইকার

অ্যামোনিয়া' ঢাললেন।—এটা ঢালা মাত্রই বোতলের জলটা টকটকে লাল হয়ে গেলো।

বলা নেই কওয়া নেই জেড সাহেব বোতলের ঐ লাল রঙটা হঠাৎ ছিটিয়ে দিলেন কয়েকজন দর্শকের গায়ে। সাদা জামাগুলি লালে লাল হয়ে গেলো। জেড সাহেবের এই আকস্মিক কাণ্ডকারখানা দেখে দর্শকদের কেউ কেউ খুবই বিরক্ত হলেন,—কেউ কেউ বা হলেন ক্রুদ্ধ। কিন্তু মনের ভাব মুখে প্রকাশ করার তেমন সুযোগ কেউ পেলেন না। কারণ, একটু বাদেই যে যার জামার পানে তাকিয়ে দেখেন—সেই লাল রঙ সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে!—এ যে একেবারে ভৌতিক কাণ্ড!

জেড সাহেব গর্বের সঙ্গে বললেন, ভৌতিক কাণ্ড নয়, এ হচ্ছে 'উবন্ত রং'। এই উবন্ত রং-এর খেলাই আজকের শেষ খেলা। 'টা-টা', 'বাই-বাই'—বলে অঙ্গভঙ্গী করতে করতে জেড সাহেব চলে গেলেন তাঁবুর বাইরে।

আনন্দে দিশাহারা হয়ে আমরা জোরসে হাততালি দিতে লাগলাম। তাঁবুর বাইরে লাউড স্পিকারে গান হতে লাগলো :

"আজ খেলা ভাঙ্গার খেলা,
খেলবি আয় আয় আয়—
খেলা ভাঙ্গার খেলা।"